লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

নব পর্যায় ৬৮ বর্ষ ■ ১২তম সংখ্যা

৩১ ডিসেম্বর, ২০০৫ ঈসাব্দ

সম্পাদকীয়

নববর্ষ ও ঈদুল আযহার শুভেচ্ছা

শুরু হয়েছে ইংরেজী নববর্ষ। আসছে ঈদুল আযহা। আমরা এ শুভক্ষণে আমাদের অগণিত পাঠক-পাঠিকা ও শুভানুধ্যায়ীগণকে জানাই নববর্ষ ও ঈদুল আযহার শুভেচ্ছা ও মুবারকবাদ।

মানুষ আশরাফুল মাখলুকাত অর্থাৎ সৃষ্টির সেরা জীব। আজ থেকে চার হাজার বছর পূর্বে এই মানুষেরই একজন হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে খোদা প্রেমের অমৃত সুধা পান করিয়ে নিজের ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্নকে খোদার ইচ্ছার কাছে জলাঞ্জলি দিয়ে অর্থাৎ কুরবানী করে অভিনব দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে জগতে পাঠিয়েছিলেন। খোদার ইচ্ছায় তিনি একবার নিজের প্রাণপ্রিয় সন্তান হযরত ইসমাইল (আঃ) ও স্ত্রী হযরত হাযেরাকে নির্জন, দুর্গম, বিরান মরুভূমিতে ফেলে রেখে যান। তাদের জন্য কোন ধরনের খাবার ও পানির ব্যবস্থাও করে যাননি। মৃত্যুর মুখে নিক্ষিপ্ত ঐ সন্তান হযরত ইসমাইল যখন কিশোর বয়সে পদার্পণ করেন তখন আবার আল্লাহ্‌র নির্দেশে তাঁকে (হযরত ইসমাইলকে) কুরবানী দিতে প্রস্তুত হয়ে যান। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর আন্তরিকতা ও নিষ্ঠাকে আল্লহ্‌তাআলা অত্যন্ত পছন্দ করেন। ফলে সন্তানের পরিবর্তে তিনি পশুকে কুরবানী করতে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে নির্দেশ দেন। আর এ ত্যাগকে জগতের সব মানুষের জন্য অনাগত কাল পর্যন্ত এক অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত বানিয়ে দেন। যে দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে নবীনেতা হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-ও তাঁর অনুসারীগণও প্রতি বছর ঈদুল আযহার দিনে কুরবানী করে যাচ্ছে।

সেদিন আল্লাহ্‌তাআলা তাঁর নবী হযরত ইব্রাহীম (আঃ) কে তাঁর পুত্রকে কুরবানী করতে বলেছেন। কিন্তু যখন তিনি তা করতে উদ্যত হলেন আল্লহ্‌তাআলা তখন তা করতে দেননি। অর্থাৎ আল্লাহ্‌তাআলা একটা মানুষ কুরবানীকে সমর্থন না করে তার পরিবেবর্তে একটি পশুকে কুরবানী করতে নির্দেশ দেন। কিন্তু আজ আমরা অত্যন্ত অবাক বিস্ময়ে লক্ষ্য করছি, এক শ্রেণীর অন্ধ মৌলবাদী ধর্মের নামে আত্মঘাতি হামলার মাধ্যমে নিজেদেরকে হত্যা করছে, হত্যা করছে অসংখ্য নিরপরাধ মানুষকে। আর বলছে এ হত্যাকান্ডের মাধ্যমে তারা আল্লাহ্‌র পথে কুরবানী করছে।

কি অদ্ভুত তাদের চিন্তা, চেতনা! কি অজ্ঞতাপূর্ণ তাদের কর্মকান্ড! কুরবানীর নামে তারা মুক্তির পথে পা না বাড়িয়ে যে ধ্বংসের মুখে পা বাড়াচ্ছে সেদিকে কোন ভ্রুক্ষেপই নেই। তারা ভুলে যাচ্ছে হযরত রসূল (সঃ) এর উক্তি–"কিয়ামত দিবসে মানুষের মধ্যকার সর্ব প্রথম যে বিচার করা হবে, তা হলো তাদের মধ্যকার রক্তপাত ও হত্যার বিচার। (বুখারী, মুসলিম)

তাই আমরা এ নতুন বছরে ও ঈদুল আযহার দিনে ঐ বিপথগামীদের আহ্বান জানাচ্ছি তোমরা ইব্রাহীমী কুরবানীর তাৎপর্যকে হৃদয়ঙ্গম কর। অন্ধকারের চক্করে আবর্তিত না হয়ে হত্যার পথ পরিহার করে যুগের ইমামের দলে চলে আস। দেখবে, এখানে এলে তুমি ধ্বংসের দিকে নয়, উন্নতির দিকে, খোদার সন্তুষ্টির দিকে প্রতি নিয়ত পা বাড়ানোর অগণিত সুযোগ পাবে। আল্লাহ্‌তাআলা তাদের শুভ বুদ্ধির উদ্রেক করুন ও প্রকৃত কুরবানীর আদর্শ বুঝার ও সে অনুসারে আমলের তৌফিক দান করুন। আমীন।

৩১ ডিসেম্বর, ২০০৫

সূচীপত্র

	পৃষ্ঠা নং
• কুরআন শরীফ	৩
• হাদীস শরীফ	৪
• অমৃতবাণী	৫
• ঈদুল আযহার খুতবা ঃ কুরবানীর তাৎপর্য *হযরত মির্যা বশীর উদ্দিন মাহমুদ আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ)* *অনুবাদ– মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান*	৬-৮
• জুমুআর খুতবা ঃ চুয়াত্তর সনের নির্যাতনের পটভূমি *হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহেঃ)* *অনুবাদ– মৌলবী আহমদ তারেক মুবাশ্বের*	৯-১৫
• হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর চিঠি-পত্র *সংকলন– ইয়াকুব আলী ইরফানী* *অনুবাদ– মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ*	১৬-১৭
• কিংবদন্তি মহাপুরুষ হযরত মির্যা তাহের আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহেঃ) *সংকলন– মৌলবী এস. এম. তৌহিদুল ইসলাম*	১৮-১৯
• খান বাহাদুর আবুল হাশেম খান চৌধুরী *মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল*	২০-২১
• আহমদীয়ত *মূল– কাযী মুহাম্মদ নাযীর সাহেব ফাযেল* *অনুবাদ– মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান*	২২-২৩
• হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আইঃ)-এর মরিশাস সফরের সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট *মৌলবী মাহমুদ আহমদ সুমন*	২৪
• মরহুম আলহাজ্জ আহমদ তৌফিক চৌধুরী স্মরণে *খন্দকার মাহবুব উল ইসলাম*	২৫-২৬
• সন্তানের প্রতি বাবা-মায়ের করনীয় *মৌলবী মোহাম্মদ মজিদুল ইসলাম মোয়াল্লেম*	২৭-২৮
• তারুয়া গ্রামের মৌলবী আহমদ আলী *কাউসার বিনতে আহমদ (বীণা)*	২৯-৩০
• ওকীলে আলার দপ্তর থেকে	৩১
• মুলাকাৎ *সংকলন ও অনুবাদ ঃ* *মরহুম আলহাজ্জ নূরুদ্দীন আমজাদ খান চৌধুরী*	৩২-৩৩
• সংবাদ	৩৪

প্রচ্ছদ ঃ দিল্লি এয়ারপোর্টে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আইঃ)-কে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করছেন ভারতীয় জামাতে আহমদীয়ার প্রতিনিধি।

ছবি ঃ জনাব আহমদ তবশির চৌধুরী

কুরআন শরীফ

সূরা আত্ তাওবা

فَإِنْ رَّجَعَكَ اللّٰهُ إِلٰى طَآئِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَاْذَنُوْكَ لِلْخُرُوْجِ فَقُلْ لَّنْ تَخْرُجُوْا مَعِيَ اَبَدًا وَّلَنْ تُقَاتِلُوْا مَعِيَ عَدُوًّا ۚ إِنَّكُمْ رَضِيْتُمْ بِالْقُعُوْدِ اَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوْا مَعَ الْخٰلِفِيْنَ ﴿٨٣﴾

৮৩। অতএব আল্লাহ্ তোমাকে তাদের এক দলের নিকট ফিরিয়ে আনলেন আর তারা তোমার নিকট (যুদ্ধে) বের হওয়ার অনুমতি চাইলে, তুমি বল, 'তোমরা আর কখনও আমার সাথে (জেহাদে) বের হবে না এবং কখনও আমার সাথে থেকে শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না। তোমরাই প্রথমবার (বাড়িতে) বসে থাকায় সন্তুষ্ট ছিলে, অতএব এখন পিছনে রয়ে যাওয়া লোকদের সাথেই বসে থাক।'

وَلَا تُصَلِّ عَلٰٓى اَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّاتَ اَبَدًا وَّلَا تَقُمْ عَلٰى قَبْرِهٖ ۚ إِنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَمَاتُوْا وَهُمْ فٰسِقُوْنَ ﴿٨٤﴾

৮৪। আর তাদের কেউ মারা গেলে তুমি কখনও তার (জানাযার) নামায পড়ো না এবং তার কবরে (দোয়ার জন্য) দাঁড়িও না; কেননা, তারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলকে অস্বীকার করেছে এবং তারা অবাধ্য থাকা অবস্থায় মারা গেছে।

وَلَا تُعْجِبْكَ اَمْوَالُهُمْ وَاَوْلَادُهُمْ ۚ إِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ اَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كٰفِرُوْنَ ﴿٨٥﴾

৮৫। এবং তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তোমাকে যেন তাক্ লাগিয়ে না দেয়। এসবের মাধ্যমে তাদেরকে এ পৃথিবীতেই শাস্তি দেয়া এবং কাফির অবস্থায় তাদের প্রাণ বের হয়ে যাওয়াটাই আল্লাহ্‌র ইচ্ছা।

وَإِذَآ اُنْزِلَتْ سُوْرَةٌ اَنْ اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَجَاهِدُوْا مَعَ رَسُوْلِهِ اسْتَاْذَنَكَ اُولُوا الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوْا ذَرْنَا نَكُنْ مَّعَ الْقٰعِدِيْنَ ﴿٨٦﴾

৮৬। আর তোমরা আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনার ও তাঁর রসূলের সাথে মিলিত হয়ে জেহাদ করার বিষয়ে কোন সূরা অবতীর্ণ হলে তাদের ধনীরা তোমার কাছে অব্যাহতি চায় এবং বলে, 'বাড়িতে বসে থাকা লোকদের সাথে থাকতে আমাদের ছেড়ে দিন।'[১২০৪]

رَضُوْا بِاَنْ يَّكُوْنُوْا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُوْنَ ﴿٨٧﴾

৮৭। তারা পেছনে রয়ে যাওয়া লোকদের[১২০৫] অন্তর্ভুক্ত হয়ে সন্তুষ্ট, আর তাদের হৃদয়ে মোহর মেরে দেয়া হয়েছে, ফলে তারা বুঝতে পারে না।

১২০৪। তফ্‌সীরাধীন আয়াতের উক্তিটি প্রকৃতপক্ষে মুনাফিকদের উচ্চারিত বলে ধরে নেয়া সমীচীন হবে না। এটা শুধু তাদের অবস্থা তুলে ধরে, যার অন্তর্নিহিত মর্ম এই যে, তারা পশ্চাতে থেকে যাওয়ার জন্য আঁ হযরত (সঃ)-এর নিকট বিভিন্ন বাহানা নিয়ে এসেছিল।

১২০৫। 'খাওয়ালিফ' অর্থ যুদ্ধের সময় যারা পিছনে থাকে, বা স্ত্রী লোকেরা (অথবা শিশুরা) যারা পাশ্চাতে গৃহে অথবা তাবুতে থাকে। এ শব্দের মর্ম এরূপ হয়ে থাকে, যথা মন্দ বা দুশ্চরিত্র ব্যক্তিরা (লেইন)।

হাদীস শরীফ

গীবত

কুরআন

مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴿١٨﴾

'সে যে কথাই বলুক না কেন, তার নিকট অবশ্যই (সংরক্ষণের নিমিত্তে) একজন অতন্দ্র প্রহরী (ফিরিশ্‌তা) নিয়োজিত রয়েছে' (সূরাতুল ক্বাফ ঃ ১৯)।

হাদীস

আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত নবী (সঃ) বলেন, বান্দা যখন আল্লাহ্‌তাআলার সন্তুষ্টিমূলক কথা বলে কিন্তু এর পরিণামের পরওয়া করে না তখন এর পরিবর্তে আল্লাহ্‌ তার মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন। আবার বান্দা যখন আল্লাহ্‌তাআলার অসন্তুষ্টিমূলক কথা বলে কিন্তু এর পরিণতি সম্পর্কে সে মোটেই চিন্তা করে না তখন এ কথা দ্বারা সে নিজেকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করে (বুখারী)।

ব্যাখ্যা ঃ মানব সভ্যতা পর্যায়ক্রমে উন্নতি লাভ করে এবং মানবীয় গুণাবলীর বিকাশ প্রাপ্ত হবার পর আল্লাহ্‌তাআলা হযরত রসূল করীম (সঃ)-কে সর্বোত্তম শিক্ষাসহ প্রেরণ করেন এবং তাঁর নেয়ামতকে পূর্ণতা দান করেন যা কুরআন, ইসলাম ও মহানবীরূপে আমাদের মাঝে বিদ্যমান। ইসলাম মানব সভ্যতাকে সুশীল সমাজে পরিণত করতে সকল শিক্ষা প্রদান করেছে এবং সম্ভাব্য সকল বিপদাবলী হ'তে সতর্ক করেছে। একটি সমাজ ধ্বংস হ'তে পারে যদি সেখানে গীবত বা পরনিন্দা ও পরচর্চা হয়। কুরআন একে মৃত ভাইয়ের মাংস খাওয়ার সাথে তুলনা করেছে। কুরআন জানাচ্ছে আমরা যা কিছু করি বা বলি খোদা তা সংরক্ষণ করেন। আর কিয়ামত দিবসে এসব কিছু সাক্ষীরূপে দাঁড়াবে।

হাদীস হতে জানা যায় যে, মানুষ খোদাতাআলার সন্তুষ্টির সাথে পরিচালিত হয়ে খোদার সন্তুষ্টির প্রতি খেয়াল রেখে কথা বলে, এর মোকাবেলায় সে কারো পরওয়া করে না যে, কে কি বললো যেমন নবীগণ এসে আল্লাহ্‌র কথা বলেন আর দুনিয়া তাদের বিরোধিতায় কত কথাই না বলে।

অনুরূপভাবে কিছু লোক থাকে যারা খোদার পরওয়া করে না মুখে যা আসে বলতে থাকে। এরূপ ব্যক্তি খোদার ক্রোধের শিকার হয়ে থাকে। পর নিন্দা ও পরচর্চা এমন ব্যধি যে, এক পর্যায়ে এসব ব্যধিতে আক্রান্ত ব্যক্তি লজ্জা শরম ত্যাগ করে বসে। সমাজের মাঝে বিশৃংখলার সৃষ্টি করে। তাই আমাদের এ ব্যাপারে সতর্ক হওয়া উচিত। আমরা অনেকেই জেনে-শুনে এমন কর্মে লিপ্ত হয়ে পড়ি। আর খোদার কথা ভুলে বসি। যার পরিণাম জাহান্নাম। সুতরাং খোদাকে সামী (সর্বশ্রোতা) ও বাসীর (সর্বদ্রষ্টা) জেনে আমাদের প্রতিটি কর্মের প্রতি খেয়াল রাখা উচিত। আল্লাহ্‌তাআলা আমাদের সবাইকে খোদার সন্তুষ্টির পথে পরিচালিত হবার শক্তি দান করুন, আমীন।

সংকলন ও অনুবাদ– মাওলানা সালেহ্‌ আহমদ
মুরব্বী সিলসিলাহ্‌

অমৃতবাণী

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)

তওবার প্রকৃত তথ্য

পাপের প্রকৃত তথ্য এরূপ নয় যে আল্লাহ্ পাপ সৃষ্টি করে সহস্র সহস্র বৎসর পরে পাপ ক্ষমা করার জন্য চিন্তা করেন। মাছির দু'টি পাখা রয়েছে; একটিতে আরোগ্য এবং অপরটিতে বিষ। এরূপ মানুষের দু'টি পাখা আছে। একটি পাপের অপরটি অনুতাপের, তওবার এবং কাতরতার। এটা একটি প্রাকৃতিক নিয়মের কথা, যেমন এক ব্যক্তি যখন দাসকে প্রহার করে তখন সে পরে অনুতাপ করে। এতে বুঝা গেল দু'টি পাখাই একত্রে কাজ করে। বিষের সঙ্গে প্রতিষেধক থাকে। এখন প্রশ্ন হয় বিষ কেন সৃষ্টি করা হলো? এর উত্তর এই যে, যদিও এটা বিষ, কিন্তু এটাকে বর্ধিত ও পরিশুদ্ধ করলে সুধা ও অমৃতে পরিণত হয়। যদি পাপ সৃষ্টি করা না হতো তাহলে গর্ব ও ঔদ্ধত্যের বিষ মানুষের মধ্যে বৃদ্ধি পেতো এবং সে ধ্বংস হয়ে যেতো। তওবা এর ক্ষতি পূরণ করে। অহংকার আত্মশ্লাঘার ব্যাধি থেকে গোনা মানুষকে রক্ষা করে। যে স্থলে নিষ্পাপ নবী প্রত্যেক দিন সত্তর বার ইস্তেগফার পড়তেন সেক্ষেত্রে আমাদেরকে কি করা উচিত? পাপ থেকে তওবা কেবল ঐ ব্যক্তিই করে যে এর (তওবার) উপর কায়েম থাকতে রাযী হয়েছে। যে ব্যক্তি গোনাকে গোনা বিশ্বাস করে সে অবশ্যই একদিন উহা বর্জন করবে।

ই'মাল্ মা শি'তা ফাকাদ গাফারতু লাকা

হাদীসে এসেছে যে, মানুষ যখন বারংবার কান্নাকাটি করে আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে তখন অবশেষে খোদাতাআলা বলেন, আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিয়েছি, এখন তুমি যা চাও কর। এর অর্থ এই যে, তিনি তার অন্তরকে পরিবর্তন করে দিয়েছেন। এখন পাপ করা স্বভাবতঃভাবে তার দৃষ্টিতে গর্হিত কাজ, যেমন কেউ মেষকে মল খেতে দেখে কখনও সে এ লোভ করবে না যে, সেও মল খাবে। তদ্রূপই সে ব্যক্তিও আদৌ পাপ করবে না যাকে আল্লাহ্ ক্ষমা করেছেন। মুসলমানগণ শূকরের মাংসকে স্বভাবগতঃভাবে ঘৃণা করে অথচ তারা অন্যান্য শত শত এমন কাজ করে যা হারাম এবং নিষিদ্ধ। এর মধ্যেও এ হিকমতই নিহিত আছে যে, এর প্রতি ঘৃণার অনুভূতি ও আবেগ রেখে দিয়েছেন এবং বুঝিয়ে দিয়েছেন যাতে এভাবে মানুষের মনে গোনাহ্‌র প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি হয়। "গোনাহ্‌র প্রাদুর্ভাবের দরুন যেন দোয়া করাতে আলস্য না হয়"। গোনাহ্‌গার তার গোনাহ্‌র আধিক্য ইত্যাদি চিন্তা করে যেন দোয়া হতে আদৌ বিরত না হয়। দোয়া আসলে সুধা ও অমৃত। দোয়া করে অবশেষে সে বুঝতে পারবে যে গোনাহ্ কত মন্দ মনে হচ্ছে। যেসব লোক গোনাহ্‌তে নিমজ্জিত হওয়ার কারণে দোয়া গ্রহণ হওয়ার ব্যাপারে নিরাশ থাকে এবং তওবা করার প্রতি মনোযোগ দেয় না, অবশেষে সে নবীগণ এবং তাঁদের ক্রিয়াশক্তিকেই অস্বীকার করে বসে।

(মলফূযাত ঃ ১ম খন্ড ৪-৫পৃঃ)

অনুবাদক ঃ **মাওলানা আব্দুল আযীয সাদেক**
মুরব্বী সিলসিলাহ্

কুরবানীর তাৎপর্য

[হযরত আমীরুল মু'মিনীন মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) কর্তৃক ২০ অক্টোবর, ১৯১৫ তারিখে ঈদগাহ্, কাদিয়ানে প্রদত্ত]

رَبَّنَآ اِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُّنَادِيْ لِلْاِيْمَانِ اَنْ اٰمِنُوْا بِرَبِّكُمْ فَاٰمَنَّا ۚ رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّاٰتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْاَبْرَارِ ۚ﴿۱۹۴﴾

رَبَّنَا وَاٰتِنَا مَا وَعَدْتَّنَا عَلٰى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۗ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ ﴿۱۹۵﴾

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ اَنِّيْ لَآ اُضِيْعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى ۚ بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ ۚ فَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَاُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَاُوْذُوْا فِيْ سَبِيْلِيْ وَقٰتَلُوْا وَقُتِلُوْا لَاُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَلَاُدْخِلَنَّهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ ۗ وَاللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الثَّوَابِ ﴿۱۹۶﴾

অর্থ ঃ "হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! নিশ্চয় আমরা এক আহ্বানকারীকে ঈমানের দিকে (আমাদেরকে এই) আহ্বান জানাতে শুনেছি ঃ 'তোমরা তোমাদের প্রভূ-প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আন', তাই আমরা ঈমান এনেছি। "অতএব হে আমাদের প্রভূ-প্রতিপালক! তুমি আমাদের পাপ ক্ষমা কর, আমাদের দোষ-ত্রুটি আমাদের থেকে দূর করে দাও, এবং আমাদেরকে পুণ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত করে মৃত্যু দাও;

হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! আর তুমি যে প্রতিশ্রুতি তোমার রসূলদের জন্য আমাদের অনুকূলে নির্ধারিত করে দিয়েছিলে (অর্থাৎ নবীদের অঙ্গীকার) তা আমাদেরকে পূর্ণ করে দাও।"

অতএব তাদের প্রভু-প্রতিপালক তাদের ডাকে সাড়া দিলেন (আর বল্লেন) ঃ 'নিশ্চয় আমি তোমাদের কোন কর্মনিষ্ঠ ব্যক্তির কর্মকে বিনষ্ট করবো না–তা সে পুরুষ হোক বা নারীই হোক। তোমরা একে অপরের সাথে সম্পর্কযুক্ত। অতএব যারা হিজরত করেছে ও যাদেরকে নিজ বাড়ী-ঘর থেকে বের করে দেয়া হয়েছে এবং আমাদের পথে যাদেরকে কষ্ট দেয়া হয়েছে আর যারা যুদ্ধ করেছে ও নিহত হয়েছে; নিশ্চয় আমি তাদের দোষ-ত্রুটি তাদের থেকে দূর করে দিব এবং নিশ্চয় আমি তাদেরকে এমন সব জান্নাতে প্রবেশ করাবো যার পাদদেশ দিয়ে নদ-নদী বয়ে যায়, এটা আল্লাহ্‌র কাছ থেকে প্রতিদানস্বরূপ, এবং আল্লাহ্‌রই কাছে রয়েছে সর্বোত্তম পুরস্কার" (সূরা আলে ইমরান ১৯৪-১৯৬)।

মানব জন্মের উদ্দেশ্য ও তাকে সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আল্লাহ্‌তাআলা কুরআন মজীদে বলেছেন, ওয়া মা খালাক্বতুল জিন্না ওয়াল ইনসা ইল্লা লিইয়্যাবুদূন অর্থাৎ আমি জিন্ন ও ইনসানকে কেবল আমার ইবাদত করার জন্যেই সৃষ্টি করেছি (সূরা যারিয়াত ঃ ৫৭)। অতএব দাস হওয়া আর খোদাতাআলার আনুগত্য ও তাকে মান্য করে তাঁর সমীপে বিনয়-নম্রতা অবলম্বন করাই হলো মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য।

অন্যান্য বস্তুগুলোও খোদাতাআলার আনুগত্য করে ও তাঁকে মান্য করে থাকে, অনেক মানুষ তো খোদার আদেশ অমান্য করে থাকে কিন্তু এসব দ্রব্যাদি কখনও খোদার আদেশ অমান্য করে না। তবে একথা বলার কি অর্থ যে, ওয়া মা খালাক্বতুল জিন্না ওয়াল ইনসা ইল্লা লিইয়্যাবুদূন –যাকে ইবাদতের জন্যে সৃষ্টি করা হয়েছে সে (আদেশ) অমান্য করে থাকে আর যার সৃষ্টি এ উদ্দেশ্যে হয় নি সে (আদেশ) অমান্য ও পরিপন্থী কাজ করে না। এর কারণ কি?

এর জন্য স্মরণ রাখা আবশ্যক, ইবাদত বা উপাসনার অর্থ হলো বিনয়-নম্রতা অবলম্বন করা (লিসানুল আরব)। ভয় করা। নিজের সব ভালবাসা সব প্রেম সব সম্পর্ক খোদার জন্যেই উৎসর্গ করা। সব কিছুকে পরিত্যাগ করে সব সম্পর্ককে ছিন্ন করে, সব মন্দ ও অহংকারমূলক ধ্যান-ধারণা থেকে আলাদা হয়ে খোদার সমীপে ঝুঁকে যাওয়া (মলফূযাত, ৩ খন্ড, পৃষ্ঠা ২৯৯)। আর ভালবাসা ও প্রেমের উঁচু থেকে উঁচু মর্যদা লাভ করা। এটা আমরা দেখতে পাই, অন্য কোন কিছুতে এটা পাওয়া যেতে পারে না। কেননা, এটাতো সেই সত্তার মাঝে হতে পারে যে কিছুটা শক্তি ও মহিমার অধিকারী। যার মাঝে এ ঈন্দ্রিয়ানুভুতিই নেই, এ উপকরণই নেই, এ শক্তিই নেই যে, দু'টি বস্তুর একটিকে পরিহার করে অন্যটিকে অবলম্বন করে এবং খোদাতাআলার উদ্দেশ্যে বিনয়-নম্রতা অবলম্বন করতে পারে। এথেকে এ দাবীই বের হয়। এটা তো কেবল মানুষের মাঝেই নিহিত। অতএব প্রকৃত অর্থে দাস মানুষই হতে পারে। এ মর্যাদা তো ফিরিশ্‌তারাও লাভ করতে পারে না। তাই মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্যই এটা যে, খোদার দাসে পরিণত হয় আর নিজের সব রকম আকাঙ্ক্ষা, নিজের সব ইচ্ছাকে পরিত্যাগ করে খোদার সমীপে ঝুঁকে যায়।

আবার মানুষকে এ পথে সফল করার জন্যে আর তার মর্যাদা বাড়ানোর জন্যে এমন কিছু আকর্ষণও নিজ সত্তায় বহন করে যা স্বভাবের পরিপন্থী হয়ে তাকে আকর্ষণ করে। কিন্তু সাথে সাথেই (আল্লাহ্‌তাআলা) নিজের পক্ষ থেকে

আহ্বানকারীকেও পাঠিয়ে দেন যিনি মানুষের পদক্ষেপকে সিরাতে মুস্তাকীম (সরল-সুদৃঢ় পথ) থেকে পিছলে পড়তে দেন না। আবার যেহেতু এমন লোক এক বিশেষ সময়ের পরে আসেন তাই স্বয়ং মানুষের মাঝে এমন সব পুণ্য শক্তি নিহিত রয়েছে যা মন্দ কর্মের ওপর প্রাধান্য লাভ করতে পারে অথবা কমপক্ষে পুণ্য ও পাপের মাঝে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারে। এই যে আয়াত কয়টি আমি এখন পাঠ করেছি এতে এসব আহ্বানকারীর উল্লেখ করা হয়েছে। এঁরা খোদার পক্ষ থেকে মানুষকে তার সৃষ্টির উদ্দেশ্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে ও এতে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এসে থাকেন। এর অর্থ এই, হে আল্লাহ্! আমরা একজন আহ্বানকারীর আহ্বান শুনেছি। সে আহ্বান কী ছিল? ব্যবসায়-বাণিজ্য বা ধন-সম্পদ বা উপকরণের দিকে আহ্বান করা উদ্দেশ্য ছিল না। বরং তা ছিল এক পবিত্র আহ্বানকারীর আহ্বান। যিনি এভাবে আহ্বান করতেন, হে মানুষ! তোমরা মেনে নাও। কাকে মানবে, **আমিনু বি রব্বিকুম**–তোমরা সেই খোদাকে মেনে নাও যিনি সৃষ্টি করেছেন। আর সামান্য অবস্থা থেকে বাড়িয়ে বড় মর্যাদা পর্যন্ত উন্নতি দিয়েছেন। তাঁর আদেশ-নিষেধ মান্য কর। আমরা তাঁর কথা মান্য করেছি **রব্বানা ফাগফিরলানা যুনূবানা**–হে আল্লাহ্! আমরা মান্য করেছি কিন্তু তোমার আদেশের ওপর চলা খুবই কঠিন কাজ। আগেও অনেক ভুল-ত্রুটি করেছি। পরেও ত্রুটি-বিচ্যুতির কারণে নিজে নিজে সুরক্ষিত থাকতে পারি না। তাই তোমার কাছে আবেদন, তুমি প্রভু-প্রতিপালক। ছোট থেকে বড়কে উন্নতি দেয়া তোমার কাজ। অতএব ঈমান বাড়িয়ে দাও। পাপ ক্ষমা হয়ে যাক। **ওয়া কাফ্‌ফির আন্না সায়্যিয়াতিনা**–বাধা দুর হয়ে যাক। বরং মন্দকে মিটিয়ে দাও। শাস্তি থেকে রক্ষা কর **ওয়া তাওয়াফ্‌ফানা মা'আল আবরর**–পুণ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত করে মৃত্যু দাও। **রব্বানা ওয়া আতিনা মা ওয়াদতানা 'আলা রুসুলিকা**–নিজ রসূলদের সাথে তুমি যে অঙ্গীকার করেছিলে সেই অঙ্গীকার পুরো করে দাও। **ওয়ালা তুখযিনা ইয়াওমাল ক্বিয়ামাহ্**–আর আমাদের কর্মকে নিজ আদেশের এমন অধীন করে দাও যেন কেয়ামত পর্যন্ত দুঃখ ও কষ্ট না লাগে। তোমার সমীপে লজ্জা না পাই। শাস্তির যোগ্য না হই।

আহ্বানকারীই এ আহ্বান করতে থাকেন। আর এ আহ্বানকারীকে যারা গ্রহণকারী তারাও এটা বলে থাকে আর দুনিয়ার জন্যে সবচে' বড় ঈদ তো এটাই হয়ে থাকে যে, এদের মাঝে কেউ আল্লাহ্‌র আয়াত পাঠকারী, তাদেরকে খোদার পক্ষ থেকে সাহায্যের শুভ-সংবাদ দানকারী। তাদেরকে তাদের প্রেমাস্পদ ও মা'বূদের সাথে সাক্ষাৎ করিয়ে দেয়ার লোক। এথেকে বেশি আনন্দের দিন আর হতে পারে না। দেখ, ভীড়ে কারও শিশু হারিয়ে যায়। দু' এক ঘন্টা পরে যখন সে তার বাবার সাক্ষাৎ পায় তখন শিশু ও তার বাবার খুবই আনন্দ হয়। এ ভাবেই খোদাতাআলার বিপদগামী বান্দা যখন খোদার সাথে সাক্ষাৎ করে এবং খোদার সান্নিধানে পৌছে তখন বান্দারও আনন্দ লাগে। আর আল্লাহ্‌তাআলাও সন্তুষ্ট হয়ে থাকেন। অতএব প্রকৃত ঈদ থাকলে এটাই। এ ঈদ তো সেই ঈদকে পথ দেখায়। ঈদ ঘরেও এবং দেশে ছড়িয়ে থাকে বলে মনে হয়। এক ব্যক্তি জঙ্গলে আছে। চারিদিকে জন্তু-জানোয়ার, ডাকাত। জীবন বিপদাপন্ন! তার ঈদের আনন্দ কি করে হতে পারে। ঈদ তো তার হতে পারে, যে ঘরে রয়েছে। আত্মীয়-স্বজনের মাঝে থাকে। বন্ধু-বান্ধবদের মাঝে থাকে। বিপদাপদ মুক্ত পরিবেশে থাকে। এভাবে যে মানুষ খোদার পথ থেকে ভ্রষ্ট, অন্ধকার জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে মরছে। তার প্রকৃত ঈদ কি হতে পারে? ঈদ তো আনন্দের নাম। আর আনন্দ মনে স্বস্তি ও মনের নিরাপত্তার মাধ্যমে সৃষ্টি হয়ে থাকে। সব ভালবাসার কেন্দ্র তো আল্লাহ্‌তাআলা। তাঁর সাথে এরকম ভালবাসা সৃষ্টি হওয়া উচিত। আর তাঁর সাথেই ভালবাসা হতে পারে। অতএব আনন্দ তারই লাভ হবে।

প্রকৃতপক্ষে ঈদতো তারই হবে যে নিজ প্রভুর সমীপে পৌঁছে গিয়ে থাকবে। কেননা, সব রকম নিরাপত্তা, আনন্দ ও ঈদের উৎস তো সেই পবিত্র সত্তা। সেই অবস্থা না সৃষ্টি হওয়ার কারণে মুসলমানদের ঈদগুলো আজকাল শোকে পরিণত হয়ে গেছে।

ঈদ এসেছে আর তাদের ঘরে ঝগড়া-বিবাদ আরম্ভ হয়ে গেছে। স্ত্রী অলংকারের জন্যে, সন্তান-সন্ততিরা কাপড়-চোপড়ের জন্যে কান্না-কাটি করছে। খাবার উপকরণ নেই। পরে ঋণী হয়ে সারাটা বছর কষ্টে কাটায়। এ ঈদ এজন্যে ছিল না বরং এ ঈদ তো নিজের মাঝে আরও একটি গুরুত্ব বহন করতো। এথেকে আজকালকার মুসলমান একেবারেই অমনোযোগী।

রোযার মাসের ঈদে তো এ বাণী দেয়া হয়েছে, মানুষকে সেই সময়ের জন্যে প্রস্তুত থাকা আবশ্যক যখন প্রভুর পক্ষ থেকে আহ্বানকারী আসে। তারা খাবার, পানীয়, স্ত্রী-পুত্র নিয়ে ব্যস্ত থেকে সময় বের করে তাঁর সাহায্যকারীদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। যেভাবে তারা রমযান মাসে এর অনুশীলন করতেছিল। আর কুরবানীর ঈদে শিখানো হয়েছে কেবল বাহ্যিক পুরস্কারই নয় বরং অভ্যন্তরীণ পুরস্কারের থেকেও যদি পৃথক হতে হয় এবং নিজ প্রাণ উৎসর্গ করতে হয় তাহলেও কুণ্ঠাবোধ করে না। যখন তোমাদের মাঝে এ অবস্থা সৃষ্টি হবে তখন তোমাদের ঈদই আসল ঈদ হবে।

খোদার নবী এসেই অঙ্গীকার নেন আর সৌভাগ্যশালীরাই অঙ্গীকার করেন–**ফাসতাজাবালাহুম রব্বুহুম** –আর তাদের প্রভু তাদের গ্রহণীয়তায় সম্মান দান করেন। যেহেতু বান্দারা একটি অঙ্গীকার করেছে তাই খোদাও এর বিপরীতে উত্তম প্রতিদান দিয়ে থাকেন। আর বলেন: **ইন্না লা উযী'উ 'আমালা 'আমিলিম্মিনকুম মিন যাকারীন আও উনসা** –আমি কোন কর্মীর কোন কাজ বিনষ্ট করি না; সে পুরুষই হোক বা নারী। আশ্চর্যের বিষয় কোন কোন ইউরোপীয়ান লেখক লিখেছেন– নারীর মাঝে যে আত্মা আছে তা ইসলাম স্বীকারই করে না (জর্জসেল, দি কোরান, পৃষ্ঠা ৮০, ম্যাক্স মুলার, দি স্যাকরেড বুক)। যদিও এ আয়াতটি এমনই, আমি অন্য কোন ঐশী গ্রন্থে এ বিষয়ের কোন উল্লেখ দেখিনি। যে ভাবে জোর দিয়ে নারীদের অধিকার ইসলাম প্রতিষ্ঠা করেছে এবং তাদের কর্মের স্বীকৃতি ও প্রতিদানের উল্লেখ করেছে অন্য কোন ধর্মের গ্রন্থে এমনটি উল্লেখ নেই। আবার কুরআন মজীদ তো যা বলে এর সম্বন্ধে দলীল-প্রমাণও উপস্থাপন করে। অতএব এখানে (আল্লাহ্) বলেছেন, পুরুষ ও নারীর সমান প্রতিদান কেন লাভ হবে? **বা'যুকুম মিন বা'যিন** তোমরা একই সত্তা থেকে। **ফাল্লাযীনা হাজারূ ও উখারিজু মিন দিয়ারিহীম**......(আল্লাহ্) বলেছেন, যারা ছেড়েছে। কি ছেড়েছে? ধনসম্পদ ছেড়েছে। নিষিদ্ধ দ্রব্য থেকে বিরত থেকেছে। আর তাদের ঘর-বাড়ী থেকে বের করে দেয়া হয়েছে। বিভিন্ন রকম দুঃখ-কষ্ট দেয়া হয়েছে। নিজেদের প্রাণের কোন মায়া করেনি। এসব লোকদের ব্যাপারে বলা হয়েছে **–লাউকাফ্‌ ফিরান্ন। মিনহুম সায়্যিয়াতিহিম ওয়া লাউদখিলান্নাহুম জান্নাতিন তাজরী মিন তাহতিহাল আনহারু**-এ দুটো কথাই বলা হয়েছে। ছায়া ঘেরা স্থানকে জান্নাত বা বাগান বলে। সেখানে কোন দুঃখ-কষ্ট হয় না। আবার এর পাদদেশে নদ-নদী প্রবহমান থাকার কথা বলে বুঝানো হয়েছে, এ বাগান সব সময় সবুজ শ্যামল থাকবে। অতএব এ পৃথিবীতেও মু'মিনদের যে পুরস্কার লাভ হবে তা অব্যাহত থাকবে।

সবচেয়ে পূর্ণ মু'মিন নবী হয়ে থাকেন। আর নবীদের নেতা হলেন হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম। আমরা এ

পরিপূর্ণ মানুষের সাথে পরিপূর্ণ রঙ্গে প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হতে দেখি। তিনি এমন হিজরত করেন যা আর কেউ করেনি। নিজের প্রাণ খোদার পথে উৎসর্গ করেন তো এমনভাবে করেন যা আর কেউ করবে না। এর দৃষ্টান্তও তাঁর মাঝে অতুলনীয়। অবশিষ্ট নবীদের ধর্ম নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে কিন্তু আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের এ পুরস্কার লাভ হয় যে, তাঁর (সঃ) সিলসিলা (জামাত) কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে। (আল্লাহ্) বলে দিয়েছেন, তোমার বাগান শুকিয়ে যাবে না। যখনই বিপর্যয় সৃষ্টি হবে তখন এক মালিকে পাঠানো হবে। তিনি একে পুনরায় সবুজ-শ্যামল করে দিবেন অর্থাৎ ধর্মের সংস্কারের প্রতি ইঙ্গিত, (সুনানে আবূ দাউদ, কিতাবুল মলাহেম) আল্লাহ্তাআলা তাঁর (সঃ) বাগানের পাদদেশে এমন সব নদ-নদী প্রবহমান রেখে দিয়েছেন, এগুলো গাছ-গাছালির পাশ দিয়ে চলে এগুলোকে সবুজ-শ্যামল বানিয়ে দেয়। যে-ব্যক্তি এ শিক্ষার ওপর আমল করে সে সালেহ্, শহীদ ও সিদ্দীকদের দলভুক্ত হয়ে যায় আর নিজ যোগ্যতানুসারে ঐশী দৈহিক ও আধ্যাত্মিক পুরস্কার থেকে মর্যাদাপূর্ণ অংশ লাভ করে এবং এর বিরুদ্ধে কেউ দাঁড়ালে সে পরাজিত হয়। দেখ, এক নিরক্ষর থেকে নিরক্ষর আহমদীকেও গয়ের আহমদী মোল্লা ভয় পায়। অতএব একজন আহ্বানকারীর আহ্বান শুনাটাই হলো সত্যিকারের ঈদ। আর তার পথে প্রাণ ও ধন-সম্পদ উৎসর্গ করে দেয়। স্মরণ রাখো, আমাদের মাঝে যতই ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকবে ততই খোদার আদেশ-নিষেধ পালনে দুর্বলতা সৃষ্টি হবে। যে-ব্যক্তি ইসলামের অনুসারী হয়েও কষ্টে রয়েছে অবশ্যই তার আনুগত্যে কিছুটা কমতি রয়েছে। কেননা, আল্লাহ্তাআলার অঙ্গীকার সত্য। ওয়া মান আসদাকু মিনাল্লাহি ক্বীলা অর্থাৎ আর কথায় আল্লাহ্র চেয়ে অধিকতর সত্যবাদী কে হতে পারে? (সূরা নিসা ঃ ১২৩)।

এসব কথা অন্যদের কাছে কিচ্ছা-কাহিনী বলে মনে হতে পারে কিন্তু আমাদের জন্যে হতে পারে না। কেননা, আমরা স্বচক্ষে খোদার এক আহ্বানকারীকে দেখেছি (অর্থাৎ হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী, মসীহে মাওউদ ও মাহদী মা'হূদ আলায়হেস সালাম)। লোকেরা তাঁকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিতে চাইলো; কিন্তু তিনি গ্রহণীয় ও সাহায্য প্রাপ্ত হলেন। যে মাটি এ মাথার মুকুটের ওপর ফেলতে চেয়েছিল তা এসব লোকের মুখে পড়লো। এ জামাত এক শিশুর মত ছিল। এর চারিদিকে কয়েকটি রক্ত-পিপাষু বাঘ ছিল। এদের মুখে মানুষের রক্ত লেগেছিল। তারা আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিল। অদৃশ্য থেকে একটি হাত বের হয়ে এলো। সেটা সেই বাঘদের জিহ্বাকে চিড়ে ফেল্লো। অতএব এ মহান সাহায্যের পর আমরা কি করে বলতে পারি, আমাদের প্রভু আমাদের সাথে নেই? এখন যেসব পুরস্কারের কমতি হয়ে থাকবে সেজন্য মনে করতে হবে যে স্বয়ং আমাদের খোদার পথে দুঃখ-কষ্ট বরণ করা আবশ্যক। আত্মাগুলোকে কুরবানীর জন্যে তৈরী করা হয়ে থাকে অর্থাৎ তারা পুরোপুরিভাবে খোদার সন্তুষ্টির ছায়াতলে এসে যায়। আমরা তাঁর পথে হিজরত করি। হিজরত কী? সেসব মন্দ ধারণাকে পরিহার করা যা আগে ছিল। এসব অসৎ বন্ধুদের পরিত্যাগ করা যারা ধর্মীয় উন্নতির পথে প্রতিবন্ধক হয়। আবার ঘর থেকে বের হয়ে যাই। ঘর থেকে অর্থ, আলস্য ও অমনোযোগিতার অবস্থানকে পরিত্যাগ করে। আবার আমাদের মাঝে এটা থাকে যেন আমরা কেবল খোদার জন্যে খোদার পথে দুঃখ-কষ্ট সহ্য করি। যে-ব্যক্তি পরম অনুগত হয় তাকে অবশ্যই দুঃখ-কষ্ট দেয়া হবে। যে-ব্যক্তি পার্থিবতার দুঃখে মুহ্যমান তার চিন্তা করা উচিত, তার ঈমানে কোন দুর্বলতা তো নেই! দেখ, গ্রামে সাদা পোষাকধারী লোক গেলে কুকুর তাকে দেখে ঘেউ ঘেউ করতে থাকে। সে তাকে অবাঞ্ছিত মনে করে। এভাবে যে-ব্যক্তি পার্থিবতার কলুষমুক্ত হয় পার্থিবতার

একজন আহ্বানকারীর আহ্বান শুনাটাই হলো সত্যিকারের ঈদ।

পূজারীরা অবশ্যই তার বিরোধিতা করবে। আর যার বিরোধিতা হয় না তাকে অবশ্যই তাদের সমান হতে হবে। তখন তারা তার বিরোধিতা করবে না। মু'মিনের অন্তরে যদি পরিবর্তন সৃষ্টি হয় আর সে যদি সব দিক থেকে পবিত্র হয় তাহলে দুনিয়ার কুকুরের ঘেউ ঘেউ করাও তার জন্যে নির্ধারিত। কুকুর তো অন্য শ্রেণীর প্রাণী। সেই কুকুরকে তো পাথর মারা যাবে কিন্তু এসব কুকুর তো এমন নয় যে, এদেরকে পাথর মারা যায় বরং এদের জন্যেও প্রতিকার রয়েছে। আর তা এই, যেন খুব সাহসিকতার সাথে এদের মোকাবেলা করা হয়। কেবল নিজের সুরক্ষাই যেন করা না হয় বরং অন্যকেও যেন রক্ষা করা হয়। আগে তো তরবারীর জিহাদ বৈধ ছিল তাই কাতালূ ওয়া কূতিলূ-এর অন্য অর্থ ছিল। আর এখন তো দলীল-প্রমাণের তরবারী দিয়ে জিহাদ করার যুগ (রূহানী খাযায়েন, ১৭ খন্ড, তোহ্ফা গোলড়াবিয়া, পৃষ্ঠা ২৭৫, রূহানী খাযায়েন, ১৬ খন্ড, খুতবা ইলহামিয়া, পৃষ্ঠা ৫৫, মলফূযাত, ৭ খন্ড, পৃষ্ঠা ৩০০)। এজন্যে সবাইকে মৃত্যু বরণ করতে হবে অর্থাৎ ধৈর্যের প্রচারে এমন কায়েমনোবাক্যে লিপ্ত হও যেন এতে মৃত্যু আসে। এসব লোকদের জন্যে ঐশী প্রতিশ্রুতি রয়েছে, তাদের মন্দ কর্মকে ঢেকে দেয়া হবে। এসব লোকদের ওপর এ ঐশী অনুগ্রহ বর্ষিত হয়ে থাকে যে, তাদের দ্বারা কোন মন্দ কর্ম সংঘটিত হয়ে গেলেও আর এটা কেউ প্রকাশ করতে চাইলে খোদার ক্রোধ তার ওপর নিপতিত হয়ে থাকে। কেননা, খোদা তো তার বান্দার সম্মান প্রতিষ্ঠা করতে চান আর এ লোক সেই সম্মানে প্রতিবন্ধক হতে চায়। অতএব (আল্লাহ্) বলেছেন, আমার সাথে পরম ভালবাসা সৃষ্টি কর। নিজ প্রভুর পথে দুঃখ-কষ্ট দেয়া হলে, সত্যের বিরুদ্ধবাদীদের মোকাবেলা কর। এর বদলে তাদের মন্দ কর্মকে মিটিয়ে দেব এবং জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেব।

যেহেতু এটা ঈদ উৎসব তাই লোকেরা কুরবানী করবে। অতএব এটা বর্ণনা করে দেয়াও সমীচীন–**লা ইঁয়া নালাল্লাহা লাহূমুহা ওয়া লা দিমাউহা ওয়া লাকিইঁয়ানালুহুত্তাক্বওয়া মিনকুম** (সূরা হাজ্জ ঃ ৩৮) অর্থাৎ কুরবানীর মাংস ও রক্ত আল্লাহ্র কাছে পৌঁছে না। কেননা, রক্ত তো মাটিতে মিশে যায় আর মাংসও পৌঁছে না। কেননা, তা তো তোমরা খেয়ে ফেল। হাড়-গোড় দূরে ফেলে দেয়া হয়। তাহলে পরে এ কুরবানীর উপকার কী? **ওয়া লাকিইঁ য়ানালুহু ত্তাক্বওয়া মিনকুম**– তোমাদের তাকওয়া খোদা পর্যন্ত পৌঁছে থাকে। আর এর উদ্দেশ্য এই, নিজ সত্তাকে কুরবানী করে দাও। কুরবানীর সময় মু'মিন অঙ্গীকার করে, যেভাবে এ ছাগল তার মাথা সামনে এগিয়ে দিয়েছে সেভাবেই নিজের আত্মার ধ্যান-ধারণা হে আমার প্রভু! তোমার ইচ্ছার মোকাবেলায় ছুরি দিয়ে কেটে ফেলছি আর এটাই সেই কথা যা খোদার প্রত্যেক আহ্বানকারী নিজ সময়ে আল্লাহ্তাআলার লোকদের কাছে চেয়ে থাকেন এবং এটা সেই প্রকৃত ঈদ। প্রত্যেক মু'মিনের এটা প্রত্যাশা করা উচিত।

আল্লাহ্তাআলা সৌভাগ্য দিলে আমরা আত্মার কুরবানী দিতে পারি। দুর্বলতা দূর হোক। পুণ্যবান বান্দাদের ভাল ভাল পুরস্কার লাভ হোক। আর আমাদের সেই ঈদের সৌভাগ্য লাভ হোক যাতে কোন দুঃখ না থাকে। এতে ঈদ পালনকারীদের মাথায় খোদার অনুগ্রহের ছায়া থাক। এ ঈদের দিনে কোন সন্ধ্যা না নামে, আমীন (আল্ ফযল ৩১, অক্টোবর, ১৯১৫ 'খুতবাতে মাহমুদ'-এর বরাতে)।

অনুবাদ– **মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান**

চুয়াত্তর সনের নির্যাতনের পটভূমি

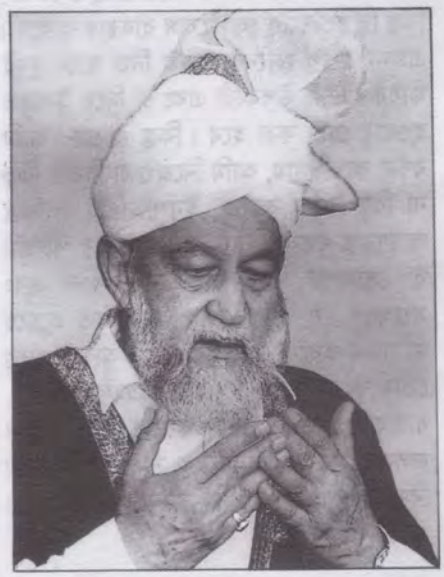

[হযরত আমীরুল মু'মিনীন মির্যা তাহের আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ রাবে'(রাহেঃ) কর্তৃক ২৫ জানুয়ারী, ১৯৮৫ তরিখে মসজিদ ফযল, লন্ডনে প্রদত্ত]

তাশাহ্হুদ তাআব্বুয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর (রাহেঃ) সূরা তাওবার নিম্নোক্ত ৩০–৩৩নং আয়াত তেলাওয়াত করেন।

وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ
ابْنُ اللَّهِ ذَٰلِكَ قَوْلُهُم بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ
الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ ﴿٣٠﴾
يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ
إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ﴿٣١﴾
هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ
عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ﴿٣٢﴾

এরপর বলেন,

পাকিস্তানের বর্তমান প্রশাসন আহমদীয়তের বিরুদ্ধে যে মিথ্যা অভিযান চলমান রেখেছে এর বিভিন্ন আকৃতি ও ধরন রয়েছে। প্রথমত দেশের নিরপরাধ জনসাধারণের ওপর চাপ প্রয়োগ করে তাদের স্বার্থকে এ শর্তের সাথে চুক্তিবদ্ধ করছে, যতক্ষণ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-কে মিথ্যা প্রতিপন্ন বা তাঁর জামাতের বিরোধিতা না করে ততক্ষণ তাদের কোন কাজ করতে দেয়া হবে না। তারা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর বিরোধিতাকে একটি সাধারণ আকৃতি প্রদান করেছে। এমন সাধারণ কোন আন্দোলন নয় যা মানুষের হৃদয় থেকে সহসা এ আকাঙ্ক্ষা জাগরিত হয় বরং দেশের আইন প্রত্যেক পাকিস্তানীকে বাধ্য করছে যেন তারা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর বিরোধিতা করে নইলে তাদেরকে বিভিন্ন সুবিধাদি থেকে বঞ্চিত করা হবে। এ পর্যন্ত যে, ভোটের অধিকারও কোন পাকিস্তানী পাবে না যতক্ষণ সে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর বিরোধিতা না করে। এ ধরনের দৃষ্টান্ত ব্যাপক হারে পাকিস্তানের ভিতরেও দেখা যায়। পাকিস্তানের যেসব লোক বাইরে বসবাস করেন তারা আন্দোলন এবং চিৎকার করে বলেন, আমরা জানতাম না সে কে? আর খোদাতাআলা নিশ্চিতরূপেই তাকে প্রেরণ করেছিলেন কিনা? এ জন্যে আমাদের মাথার ওপরে এ গুনাহ্ অর্পণ করো না,কিন্তু যেহেতু তাদের কাজ-কর্ম চলতে পারতো না, আর তাদেরকে বাধ্য করা হচ্ছিল তাই পরিশেষে তাদের একটি বিশাল অংশ অস্বীকারের সত্যায়ন করতে বাধ্য হয়েছে।

এরপর মিথ্যা সাব্যস্ত করার দ্বিতীয় পদ্ধতি হচ্ছে, আহমদীদেরকে তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখা, তাদের প্রতি যুলুম-অত্যাচার করা আর তাদের ওপর অত্যাচারকারীদের সহায়তা করা, তাদের সম্পদ হরণকারীদের হিফাযত করা এবং তাদের প্রাণ হরণকারীদের প্রশাসনের ছত্রছায়ায় নিরাপত্তা প্রদান করা। আর আহমদীয়তের সত্যতার সাক্ষ্যকে অথবা আহমদীয়তের পক্ষে অর্জিত সাক্ষ্যকে মিথ্যা সাব্যস্ত করা, বিরুদ্ধবাদীদের বানানো সাক্ষ্যকে গ্রহণ করে নেয়া।

মোটকথা এ ধরনের অগণিত চাপ রয়েছে, যেমন চাকুরী থেকে বঞ্চিত করা, ছাত্রদের শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা, দৈনন্দিন জীবনে এত বেশি চাপ বা প্রেশার প্রয়োগ করা হচ্ছে, ফলে তারা মনে করছে, আহমদীরা পরিশেষে আহমদীয়ত ত্যাগ করতে বাধ্য হবে। কিন্তু যেভাবে গোটা বিশ্ব অবগত আছে, আর পাকিস্তানেও অতি দ্রুত এ চেতনা সৃষ্টি হচ্ছে, এসব মাধ্যম আহমদীদেরকে মুরতাদ বানানোর ক্ষেত্রে সফলতা লাভ করেনি। বরং এর সম্পূর্ণ উল্টো ফলাফল প্রদর্শিত হয়েছে। এত আবেগ আর শক্তির সাথে ঈমান উদ্বেলিত হচ্ছে আর আন্তরিকতায় প্রবৃদ্ধি ঘটেছে আর কুরবানী বা ত্যাগের নতুন আকাঙ্ক্ষা ও উদ্দীপনা সৃষ্টি হচ্ছে। ইতিপূর্বে এ অবস্থা এত প্রবলভাবে বাহ্যত দেখা যেতো না। আর বিস্তারিতভাবে জামাতে এমন উৎসাহ ও উদ্যম এবং কুরবানী ও ত্যাগের উন্নত সংকল্প ইতিপূর্বে দেখা যায়নি। তাই আল্লাহ্তাআলার কৃপায় এ দৃষ্টিকোণ থেকেও প্রশাসনকে এ চেষ্টা-প্রচেষ্টায় ব্যর্থ করে দিয়েছে। আর তাদের চেষ্টা-প্রচেষ্টায় ব্যর্থতার যতটুকু সম্পর্ক রয়েছে অর্থাৎ প্রকৃত বাস্তবতা হচ্ছে, জামাতের বন্ধুদের কাছ থেকে যেসব সংবাদাদি পাওয়া যায় তা হচ্ছে, প্রত্যেক পাকিস্তানী যিনি আহমদী নন, যখন মিথ্যা প্রতিপাদনের ওপর স্বাক্ষর প্রদান করে তখন তার মাঝে একটি ভয়-ভীতির অবস্থা অনুভূত হয়, তার হৃদয়ে এ প্রশ্ন উত্থিত হতে দেখে, আমি যে ব্যক্তিকে মিথ্যা-প্রতিপন্ন করছি তার দাবীর ওপর যাচাই-বাছাই করছি না করিনি। আমি তার সম্বন্ধে যাচাই-বাছাই করার পর পুরো নিশ্চিতরূপেই কি এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি? সেই ব্যক্তি মিথ্যাবাদী নাকি

কেবলমাত্র জাগতিক সুবিধাদি লাভের প্রত্যাশায় বাধ্য হয়ে অন্যায়ভাবে "মিথ্যা প্রতিপাদনের" ওপর স্বাক্ষর করানো হচ্ছে। অথবা মিথ্যা প্রতিপন্ন করার ক্ষেত্রে বাধ্য করা হচ্ছে। এ চেতনা বা অনুভব সাধারণভাবে সৃষ্টি হচ্ছে। আর সৌন্দর্যকে উদ্ভাসিত করার যে ব্যবস্থা আমরা করতে পারতাম না তা আল্লাহ্‌র পরিকল্পনায় এভাবে হচ্ছে। তা না হলে ইতিপূর্বে জনসাধারণের মাঝে হৃদয়গ্রাহী অবস্থা বিরাজ করছিলো ও অজ্ঞতা সাধারণ ছিলো। আর প্রকৃত ঘটনা হচ্ছে, মুসলমানরা বিভিন্ন দলে-উপদলে বিভক্ত ছিলো। নিজ ফিরকা সম্বন্ধে অনেক কম সংখ্যক লোক এরূপ ছিলো যারা তাদের ধর্ম বিশ্বাস সম্বন্ধে অবহিত ছিল। আমাদের ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গীর ভিত্তি কি? ইসলাম কার্যত আমাদের কাছে কি প্রত্যাশা বা দাবী করে? এক ধরনের উদাসীনতায় জীবন অতিবাহিতকারী লোকেরা বাহ্যত বিভিন্ন ফিরকার মাঝে বিভক্ত ছিলো। আর যেহেতু জ্ঞান ছিলো না এজন্য জামাতে আহমদীয়ার বিষয়েও জ্ঞানের স্বল্পতা হেতু হৃদয়ে আকর্ষণ ছিলো না। স্বল্প সংখ্যক এমন ছিলো যারা এ কারণে বিরোধিতা করতো। তারা মনে করতো জামাতে আহমদীয়া মিথ্যা। এক বিশাল অংশ মৌলভীদের ভয়ে আর সাধারণ জনতার চাপের মুখে চুপচাপ তামাশা দেখছিলো। এথেকে অধিক সামর্থ্য তাদের ছিল না। পাকিস্তানের প্রান্তে প্রান্তে এমন এলাকায়ও যেখানে কখনই কোন আহমদী কোন আওয়াজ দেয়নি, এখন সেখানে কেবলমাত্র মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর নামই পৌঁছেনি বরং সর্বত্র আন্দোলিত করে দিয়েছে এবং একেবারে চরম অজ্ঞ ব্যক্তিকেও এমন সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে বাধ্য করা হয়েছে, যে সম্বন্ধে সে পূর্বে অনবহিত ছিলো। অতএব এর ফলশ্রুতিতে আহমদীয়তের যে আশচর্যজনক অবস্থা সৃষ্টি হচ্ছে এর প্রভাব এখন থেকেই প্রকাশিত হতে আরম্ভ করছে।

তৃতীয় প্রচেষ্টা হচ্ছে, উন্মুক্ত প্রতিজ্ঞার ওপর। লিটারেচার প্রকাশনার মাধ্যমে এটা হয়েছে এবং সমগ্র বিশ্বে বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্ন লিফলেট বিতরণ করা হয়েছে। পাকিস্তানী দূতাবাসের মাধ্যমেও এবং অন্যান্য মাধ্যমেও। এতে নিয়মিত মিথ্যা ও অপবাদের আশ্রয় গ্রহণের মাধ্যমে হযরত আকদস মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর জীবনকে কলঙ্কিত করার অপচেষ্টা করা হয়েছে এবং জামাতের জন্য সবচেয়ে বেশি কষ্টদায়ক কাজ বিশেষভাবে পাকিস্তানী আহমদীদের জন্য সেখানে পত্র-পত্রিকায়ও দিনরাত এটাই হচ্ছে, এবং প্রশাসনও কোটি কোটি টাকা খরচ করে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-কে গালি দেওয়াচ্ছে আর দিচ্ছে। মিথ্যা অপবাদের ক্ষেত্রে কোন প্রকারের জাগতিক বুদ্ধি-বিবেচনা আর মানব প্রকৃতির রীতি বা আইনকে দৃষ্টিপটে রাখছে না। এমন সব কাল্পনিক গল্প বানিয়ে বিভিন্ন ভাষায় হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) সম্বন্ধে প্রকাশ করা হচ্ছে এবং সারা বিশ্বে এসব প্রচার করা হচ্ছে যাতে বুদ্ধি লোপ পাওয়ার উপক্রম হয়। এমন একটি ভদ্র ও কৃষ্টিমনা যুগেও এমন ধরনের চারিত্রিক পতনের দৃষ্টান্ত দেখতে পাওয়া যায়! সাধারণ জনগণের মঝেও যদি এ বিষয়টি দেখতে পাওয়া যায় তাহলে এটি চরম চারিত্রিক পতনের নিদর্শন হিসেবে বিবেচিত হবে। সরকার নাস্তিক হলেও দায়িত্ব পালনের প্রমাণ দিয়ে থাকে। তাদের ভাষার কিছু বৈশিষ্ট্য বা কৃষ্টি-সভ্যতা থাকে যা তারা অনুসরণ করে। কোন 'দলকে' বা শত্রুকে চরম খারাপ বলে তারা মনে করা সত্ত্বেও জাগতিক রীতি-নীতির চাহিদা তারা পূর্ণ করেন। অথচ পৃথিবীতে এমন একটি প্রশাসন প্রকাশিত হয়েছে যা সব বৈশিষ্ট্যের চাহিদাকে ভেঙ্গে-চূড়ে ফেলে দিয়েছে এবং আহরারীদের নোংরা ভাষা যা কখনও মুচীদের দরজায় শোনা যেত কখনও অমৃতসরের বাজারে শোনা যেত অথবা কাদিয়ানের ওপর যখন তারা কল্পিত বিজয় লাভের উদ্দেশ্যে কাদিয়ানের ওপর আক্রমণ করতো তখন এ ভাষা শোনা যেত এখন তা প্রশাসনের ভাষায় পরিণত হয়েছে। এবং পরিপূর্ণভাবে এ সরকারের চরিত্রের ওপর, তাদের ভূমিকার ওপর, এদের প্রশাসনিক পদ্ধতি পর্যন্ত আহরারীদের আচরণ অধিগ্রহণ করেছে। অতএব এই প্রশাসনের এরূপ চিত্রই সমগ্র বিশ্বে উদ্ভাসিত হচ্ছে যখন তারা আহমদীয়তের ওপর এবং হযরত আকদস মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর ওপর মনগড়া আপত্তি তৈরি করে আক্রমণ করে। একটি ছোট্ট পুস্তিকার নাম হচ্ছে "কাদিয়ানীয়ত" বা কাদিয়ানী ইসলামের জন্য একটি "মহা বিপদ"। একে "শ্বেত পত্রের" নামে সারা বিশ্বে বিশাল সংখ্যায় পাঠানো হয়েছে। গত এক জুমুআয় আমি এ কথা উপস্থাপন করেছিলাম, আমার সংকল্প হচ্ছে ইনশাআল্লাহ্ সে সম্বন্ধে নিজেই এক একটি আপত্তিকে সামনে রেখে কিছু বর্ণনা করবো। কিন্তু ইতোমধ্যে জামাতের বিভিন্ন আলেম এবং লেখক নিজের পক্ষ থেকে প্রচেষ্টা করছেন। অনেককে আমি সংবাদ পাঠিয়েছি এবং খুব চমৎকার প্রবন্ধ তারা রচনা করেছেন। এভাবেই কিছু ভালো প্রবন্ধ অনেকাংশে প্রকাশনার জন্য প্রস্তুত রয়েছে যদিও প্রবন্ধ সকল আহমদীর কাছে পৌঁছানো কঠিন। খুতবার মাধ্যমে যোগাযোগ যত গভীরভাবে জামাতের সাথে সম্ভব তা অন্য আর কোন মাধ্যমে সম্ভব নয়। জামাতের একটি অংশ অশিক্ষিতরাও রয়েছেন আর একটি অংশ যেখানে পড়ার কোন প্রচলনই নেই আর কিছু লোকের স্বভাবগতভাবেই পাঠের অভ্যেস নেই তাই এজন্য ক্যাসেটের মাধ্যমে যে যোগাযোগ এবং বিভিন্ন ভাষায় ক্যাসেটের অনুবাদ করে যেসব মুরব্বী দ্রুত জামাতের সাথে যোগাযোগ করে আমি এ কাজের অনেক উপকরিতা দেখেছি এবং এটি একটি সহজ এবং উপকারী, কিন্তু বিঘ্নিত হচ্ছে যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে। এজন্য এরূপ জ্ঞানের প্রচেষ্টা নিজ স্থানে খুবই কার্যকর এবং উপকারী এবং এ দিয়ে উপকৃত হওয়ার চেষ্টা করা হবে। কিন্তু যেভাবে আমি বর্ণনা করেছিলাম, আমি নিজেও এ বিষয়ে কিছু না কিছু বর্ণনা করবো, ইন্‌শাআল্লাহ্ । কিন্তু আজকের খুতবায় আমি সর্বপ্রথম এর পটভূমি বা প্রেক্ষাপট নিয়ে আলোচনা করবো এবং সংক্ষেপে যে আপত্তিসমূহ আরোপিত হয়েছে তা বর্ণনা করবো এবং পরবর্তীতে আল্লাহ্ প্রদত্ত তৌফীক অনুযায়ী, সম্ভবত খুতবার মাধ্যমে, ধারাবাহিক উত্তর প্রদান করবো অথবা কোন জলসার সময় যখন অনেক সময় পাওয়া যায় কিছু বিষয় সেখানেও বর্ণনা করার চেষ্টা করবো।

এর প্রেক্ষাপট বা পটভূমি জামাতের জানা আবশ্যক। রীতিমত একটি গভীর ও দীর্ঘ ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। সাধারণভাবে নিশ্চিতরূপে মানুষের এটা জানা নেই, কি হয়ে আসছে আর এখন কি হচ্ছে। বর্তমান ঘটনাবলীর কোন কোন কঠোরতা ৭৪ এর ঘটনাবলীর সাথে সামঞ্জস্য রাখে, পটভূমির ধরনতো কিছুটা এরূপই। জামাতের বিরুদ্ধে এই যে কঠোরতার প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা কিভাবে সম্মুখে অগ্রসর হয়েছে এবং এখন কি রূপ পরিগ্রহ করেছে! আরেকটি প্রেক্ষাপট যার সাথে বহির্বিশ্বের শক্তির সম্পর্ক রয়েছে। বিধর্মীদের সাথেও সম্পর্কযুক্ত। বর্তমান সময়ের বড় বড়

শক্তি রয়েছে। তারা এ অপচেষ্টাকে লালন করছে। যাদের সবটা সংকল্প রীতিমত এক পরিকল্পনা বা ষড়যন্ত্রের আকারে আজ থেকে বহুবছর পূর্বে নীল নক্শার আকৃতি ধারণ করেছিলো। ধারাবাহিকভাবে পত্র-পত্রিকায় একথা প্রকাশিত হয়েছে, রীতিমত আপোসে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিলো, মধ্যপ্রাচ্যের টাকা, কমপক্ষে বিশ বছর ধরে আমি অবগত আছি, একটি ষড়যন্ত্রের অধীনে জামাতের বিরুদ্ধে হতে আরম্ভ করেছে এবং এজন্য বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়কে পৃষ্ঠপোষকতা দেয়া হয়েছে। পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ যে অবস্থা এতে এক অনুপ্রবেশে লাভের একটা মাধ্যম বানানো হয়েছিলো। এর অনেক বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। সুযোগ হলে আর প্রয়োজন দেখা দিলে পরবর্তীতে বর্ণনা করবো।

বর্তমান অভিযানের সাথে ১৯৭৪ সালের একটি গভীর সম্পর্ক রয়েছে। এবং পাকিস্তানে ১৯৭৪ এর ভিত্তিও ৭৩ সনের আইনের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিলো। এতে এমন অনেক ধারার মাঝে এমন সব বাক্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিলো যার ফলশ্রুতিতে মানুষের মস্তিষ্ক এদিকে নিবিষ্ট থাকে আর জামাতে আহমদীয়াকে অন্যান্য পাকিস্তানী জনগণের থেকে একটি পৃথক ও তুলনামূক সামান্য পদমর্যাদা প্রদান করা হয়। সুতরাং আমি এ বিষয়ের দিকে হযরত খলীফাতুল মসীহ সালেস (রাঃ)-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করি এবং যতটুকু সম্ভব ছিলো জামাত বিভিন্ন প্রকারের প্রচেষ্টা করেছে। কিন্তু সেই চেষ্টা-প্রচেষ্টার সময় আমার মাঝে বিশেষভাবে এ অনুভূতির সৃষ্টি হলো, এটি কোন এক সরকারের কাজ নয় বরং একটি দীর্ঘ ও সুদৃঢ় পরিকল্পনা এবং এ বিষয় সামনে অগ্রসর হতে হবে। যাহোক ৭৪-এ সেই কথা পুরোপুরি স্পষ্টভাবে সামনে এসেছে। ৭৪-এ সে সময়ের সরকার আর বর্তমান সরকারের মাঝে একটি সুস্পষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান। সেই প্রশাসনের মাঝে আত্মসম্ভ্রমবোধ ছিলো। নিজ দেশের বাসিন্দাদের লজ্জা-শরম ছিলো আর বহির্বিশ্বেও আত্মসম্ভ্রমবোধ ছিলো। শত্রুতায় কোন ঘাটতি ছিলো না। পরিকল্পনা বা ষড়যন্ত্রের সাথে যতটুকু সম্পর্ক আর জামাতের ভিত্তির ওপর চরম আক্রমণ করার যতটুকু সম্পর্ক ছিলো দু'পক্ষেই এটি সামঞ্জস্যপূর্ণ। ভূট্টো সাহেবের সময়কার প্রশাসন আর বর্তমান প্রশাসনের এ দৃষ্টিকোণ থেকে কোন বৈপরীত্য নেই। কিন্তু আত্মসম্ভ্রমবোধের যতটুকু সম্পর্ক সেখানে সুস্পষ্ট পার্থক্য বিরাজমান। ভুট্টো সাহেব একজন জননেতা ছিলেন আর জনতার ভালবাসার দাবীদার ছিলেন। তিনি নিজ দেশের জনসাধারণের সাথে প্রত্যেকের প্রাণের নেতা হিসেব বিবেচিত হতে চাইতেন। আর তারা যেন এটা অনুভব না করে, আমি (অর্থাৎ ভূট্টো সাহেব) ধোঁকা দিয়ে উচ্চাভিলাষি পদ্ধতি অবলম্বন করছি কেবলমাত্র একান্ত অপারগতা ছাড়া। তাই জামাতে আহমদীয়ার বিষয়ে তিনি যে পদক্ষেপ নিয়েছিলেন এর পূর্বে একে একটি সাধারণ প্রতিষ্ঠানের আকৃতি প্রদান করেছিলেন। এবং জাতীয় সংসদে সেই বিষয়কে উপস্থাপন করা হয়েছিলো আর জামাতকে নিজ পক্ষ অবলম্বনের একটি সুযোগ দেয়া হয়েছিলো এবং বহির্বিশ্বেও এর আশঙ্কা অত্যন্ত বিস্তৃত ছিলো। কেবলমাত্র পাকিস্তানকে নিয়েই সন্তুষ্ট ছিলো না বরং স্বীয় প্রভাব প্রতিপত্তি আশেপাশের এলাকাসমূহে সৃষ্টি করতে চাইতো। দূরপ্রাচ্যের বড় নেতা হিসেবে যেভাবে নেহেরু হয়েছিলেন তদ্রূপই তার আকাঙ্ক্ষা ছিলো। তিনিও যেন পাকিস্তানের পথ প্রদর্শক হিসেবেই নয় বরং দূরপ্রাচ্যে এক মহান নেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হন। আর সমগ্র বিশ্বে স্বীয় রাজনীতিকে উজ্জ্বলতর করেন। কেননা, বহির্বিশ্বের চোখেও আত্মসম্ভ্রম বেশি ছিলো; তিনি চাইতেন তাদের সামনে জামাতের বিষয়টিকে এমনভাবে উপস্থাপন করা হোক যেন তিনি একেবারে অপারগ আর একান্ত বাধ্য হয়ে গিয়েছিলেন। তা সত্ত্বেও তিনি জনসাধারণের চাপকে গ্রহণ করেননি এবং পুরোপুরিভাবে জামাতে আহমদীয়াকে সুযোগ দিয়েছেন যেন নিজেদের বিষয়াবলীকে উপস্থাপন করে। তাদের নেতৃবৃন্দকে ডেকে, তাদের সাথে আরো কিছু লোককে ডেকে এক দীর্ঘ সময় জাতীয় সংসদে এ বিষয়ের মীমাংসার লক্ষ্যে সময় দিয়েছেন। এবং বিচার-বিবেচনার পরে এ ফলাফল নির্ধারণ করেছেন, এ ক্ষেত্রে আমি কি করতে পারি? অতএব সেই আত্মসম্ভ্রমবোধের একটি দৃষ্টান্ত এখানে দেখা যায়। এজন্য যে, জনতার সরকারও নয় আর বহির্বিশ্বের কোন মতামতের মুখোমুখি তা-ও নয়। কেননা, একজন প্রশাসক মূলত একজন প্রশাসকই। এজন্য বাহ্যত যত চেষ্টাই করুক না কেন প্রশাসনিকভাবেই এ সিদ্ধান্ত হওয়া অবধারিত। যা কিছুই হোক, বিশ্ব যা কিছুই বলুক না কেন সে দিকে কোন ভ্রুক্ষেপ নেই। চেষ্টা করে দেখবো যদি সারা বিশ্বের হৃদয় জয় সহজলভ্য হয় তাহলে হবে আর না হলেও প্রশাসনিক কর্মকান্ডে তো পিছু হটতে পারে না। এজন্য প্রশাসনের মাঝে আত্মসম্ভ্রম বোধের উদাসীনতা বর্তমান অভিযানের ক্ষেত্রে একেবারে প্রকাশ্য।

সেই সরকার স্বীয় সিদ্ধান্তের সময়ে জামাতকে সুযোগতো দিয়েছিলো এবং ১৪ দিন জাতীয় সংসদে প্রশ্ন-উত্তর হয়েছে। জামাত লিখিতভাবে ধর্মবিশ্বাস উপস্থাপন করছে, কিন্তু সেই সাথে সরকার অত্যন্ত সাবধান ও সচেতন ছিলো এবং সে সময় তারা এটা অনুভব করতে পেরেছিল যে, এ সকল কথা সাধারণ্যে প্রকাশ পেলে আর যে প্রশ্নোত্তর জাতীয় সংসদে হচ্ছে এর পুর্ণাঙ্গ বিবরণ সমগ্র বিশ্বের সামনে উপস্থাপন করা হলে আমাদের উদ্দেশ্য সমাধা হবে না বরং উল্টো ফল প্রকাশ পেতে পারে। অন্যথায় একেবারেই সম্ভব যে, এতে লোকেরা বলবে, জামাতকে সব ধরনের অধিকার প্রদান করার পরও একটি বৈধ সিদ্ধান্ত হয়েছে। অথচ এর ফলে বিশ্ব পুরোপুরি উল্টো ফলাফল নির্ধারণ করেছে যে, জামাতের ওপর চরম পর্যায়ের অত্যাচার হয়েছে বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। এত সুদৃঢ় দলিল ও এত মজবুত প্রমাণ যা বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ দু'দিক থেকেই সাব্যস্ত। এরপর জামাতে আহমদীয়া সঠিক পথের ওপর প্রতিষ্ঠিত নেই তোমরা কি করে ফলাফল নির্ধারণ কর? সুতরাং তাদের দূরদর্শিতা এটা সাব্যস্ত করেছে, জামাতকে আইন ও প্রশাসন বাধ্য করেছে। যে-সব কার্যক্রম হচ্ছে এর কোন প্রকারের নোট বা Recording নিজেদের কাছে যেন সংরক্ষণ না করে। আর এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিলো, এ কার্যক্রমকে বিশ্বেও প্রকাশ হতে দেয়া হবে না। সেই কার্যক্রমের ফলাফল কি ছিলো? তা একথায় বুঝা যেতে পারে। জাতীয় সংসদের একজন সাংসদের কাছে কোন এক সময়ে প্রশ্ন করা হলো, আপনি সেই কার্যক্রমকে ছাপাচ্ছেন না কেন? গোটা সংসদের সব সাংসদ যখন আপনার বর্ণনা অনুযায়ী সম্মিলিত সিদ্ধান্ত প্রদান করেছেন যে, জামাতে আহমদীয়া নিজেদের বিশ্বাসের ক্ষেত্রে ভুল। এর সাথে ইসলামের সম্পর্ক নেই। তাহলে এটা প্রকাশ করুন আর সমগ্র বিশ্বকে অবহিত করুন। তখন সে হেসে উত্তর দিলো, ছাপাবো? শোকর কর যে, আমরা ছাপাইনি। আমরা যদি ছাপিয়ে

দেই তাহলে অর্ধেক পাকিস্তান আহমদী হয়ে যাবে। আমি মনে করি অর্ধেক তো সে নিজের পক্ষ থেকে বলেছে। প্রকৃতপক্ষে পাকিস্তানে ভদ্র এবং সম্ভ্রান্ত লোকদের কাছে যদি জামাতে আহমদীয়ার বিশ্বাস কি এটা পৌঁছে যায় তাহলে গোটা পাকিস্তান আহমদী না হওয়ার কোন কারণ নেই। কেবলমাত্র কিছু চিহ্নিত লোক যারা সর্বদা বঞ্চিত থেকে যায় তাদের তকদীরে হেদায়াত নেই। "ওয়া মাইইউযলিলহু" দুনিয়ার কোন এমন শক্তি নেই যা তাদেরকে হেদায়াত দিতে পারে যাদেরকে আল্লাহ্‌তাআলা হেদায়াত দিতে চান না। এ ধরনের ব্যতিক্রমতো রয়েছে কিন্তু পাকিস্তানের এক বিরাট অংশ সম্বন্ধে আমার সুধারণা রয়েছে, যদি সঠিকভাবে তাদের কাছে জামাতে আহমদীয়ার বিবরণ পৌঁছে বিশেষভাবে এসময়ের প্রজন্মের কাছে যারা তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি পূর্ণতার আকৃতি বহন করে এবং অন্ধ অনুসরণের প্রতি এমন ঝোঁক নেই যেভাবে অতীতের প্রজন্ম ঝুঁকে ছিলো তাই নিশ্চিতরূপে তাদের মাঝ থেকে এক বিরাট অংশ আল্লাহ্‌র কৃপায় আহমদী হয়ে যাবে। 13-1-2006 Read again.

সুতরাং এ সরকার এথেকে এমন দূরদর্শিতা লাভ করছে, জামাতে আহমদীয়ার ওপর একতরফা আক্রমণ তো করে কিন্তু উত্তর দেয়ার অনুমতিই নেই। সুযোগ সৃষ্টি হতে দেয় নি। আক্রমণের পূর্বেই এমন নিয়ম-পদ্ধতি অবলম্বন করেছে আর জামাতের সেসব প্রকাশনা বাজেয়াপ্ত করেছে যাতে ভবিষ্যত আক্রমণের উত্তর রয়েছে আর সরকারের পলিসির মাঝে এটা তো প্রাবল্যের সৃষ্টি করে। এর ফলে বাহ্যত একটি নির্বুদ্ধিতাও প্রকাশ পায় কিন্তু এতে নির্বুদ্ধিতার চেয়ে বেশি চালাকি ও বেশি দুষ্টামী পরিলক্ষিত হয়। একদিকে এরা বলে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর লিটারেচার এজন্য বাজেয়াপ্ত করা হচ্ছে যেন এতে পাকিস্তানের জনগণের হৃদয়ে অসন্তুষ্টির সৃষ্টি না হয় আর অন্যদিকে কেবলমাত্র সেই 'বাক্য' নির্বাচিত করে ছাপানো হচ্ছে যদ্বারা তাদের ধারণা অনুযায়ী। তাদের হৃদয়ে অসন্তোষের সৃষ্টি হয় কত বড় আহম্মকসুলভ কথা, কত বড় নির্বুদ্ধিতা! বলছো, আমরা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর পুস্তক এজন্য বাজেয়াপ্ত করেছি, এতে মুসলমান জনসাধারণ বিশেষত পাকিস্তানী জনগণের হৃদয় ব্যথিত হয়। আর সেই হৃদয়ের ব্যথা লাঘবের চিকিৎসাস্বরূপ এ ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেই অংশ প্রকাশ করে না যাতে হৃদয়ে ব্যথিত হয় না আর এর প্রকাশনা প্রশাসন বন্ধ করে দিয়েছে। আর এর ফলে তোমার হৃদয়ে যাতে কষ্টের সৃষ্টি হয় তা সরকারীভাবে কোটিকোটি টাকা খরচ করে সারা বিশ্বে বিতরণ করছো। তাই বাহ্যত এটা প্রাবাল্য বা প্রবৃদ্ধি কিন্তু এ প্রবৃদ্ধি এক প্রকার চালাকীর ফসল। এক নোংরা অপবিত্র ষড়যন্ত্রমূলক আক্রমণ এরা করতোই। কেননা, মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর পুস্তকাদিতে এদের উত্তর সংরক্ষিত রয়েছে এবং প্রত্যেক ভদ্র ব্যক্তি যখন এ পুস্তকাদি পর্যলোচনা করে, যখন বিষয়বস্তুর সাথে যোগসূত্রকে দেখে তখন আপত্তির বিষয়গুলো আপনাআপনি সমাধান হয়ে যায়। অতএব জাতীয় সংসদের কার্যক্রমের সময়ে যেহেতু হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহেঃ) আমাকে সাথে থাকার সুযোগ দিয়েছিলেন আমি এবং আমার অন্যান্য

প্রকৃতপক্ষে পাকিস্তানে ভদ্র এবং সম্ভ্রান্ত লোকদের কাছে যদি জামাতে আহমদীয়ার বিশ্বাস কি এটা পৌঁছে যায় তাহলে গোটা পাকিস্তান আহমদী না হওয়ার কোন কারণ নেই।

সাথীরা অত্যন্ত আশ্চর্যের সাথে পর্যবেক্ষণ করেছি, আমাদের প্রত্যাশার চেয়ে বেশি সর্বদাই এ ঘটনা ঘটেছে। যখন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর পুস্তকের ওপর কোনরূপ আক্রমণ করা হয়েছে তখন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাঃ) পুস্তকের সেই অংশের কিছু পূর্ব থেকে এবং কিছু পরের অংশ পাঠ করে শুনাচ্ছিলেন এবং এর পরে আর কোন উত্তর দেয়ার প্রয়োজনই পড়তো না। শ্রবণকারীদের চেহারার ওপর প্রশান্তি এসে যেত। এই আক্রমণ কল্পিত আর বানোয়াট। সত্যের সাথে এর দূরতম সম্পর্কও নেই। কিছু বিস্তারিত বলার প্রয়োজন হলে সাথেসাথে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেছেন; কিন্তু হযরত আকদস মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর রচনাবলী স্বীয় সত্তায় যথেষ্ট উত্তর বহন করতো। কেবলমাত্র বিষয়বস্তুর যোগসূত্র থেকে পৃথক করে একটি অংশকে ভুল অর্থে আপত্তির আকারে পেশ করা হলে এতে হৃদয় ব্যথিত হতে পারে। কেননা, উদ্দেশ্য তা নয়। সেই কথা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলতেই পারেন না যা তার প্রতি আরোপ করা হচ্ছে। অতএব কল্পনা-প্রসূত কথা তৈরী করে তা প্রকাশ করা হচ্ছে বা ছাপানো হচ্ছে আর হৃদয়গ্রাহী উত্তরকে লুকিয়ে ফেলা হয়েছে। অতএব এই ছিলো এ সরকারের কাজের হিকমত। এর ফলশ্রুতিতে এ ঘটনা ঘটার পূর্বেই পুস্তকাদি বাজেয়াপ্ত করা আরম্ভ হয়ে গিয়েছিলো। এরপর পুস্তকাদি ছেড়ে প্রেসও বন্ধ করেছে। এই ভীরুতা সর্বদা দুর্বলতার চিহ্ন হিসেবে বিবেচিত হয় এবং তারা তাদের পরাজয় মেনে নিয়েছে। দুনিয়ার এমন কোন শক্তি যা দলিল-প্রমাণ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বা শক্তিশালী তা কখনই অস্ত্র ধারণ করে না। এবং অন্যর কথা বলার পথে অন্তরায় সৃষ্টি করে না। এ কাজ বুদ্ধির বিপরীতে আর তাদের স্বার্থের পরিপন্থী। এজন্য সমস্ত আইনি প্রচেষ্টা যা এ কথায় প্রয়োগ করা হচ্ছে যে, কোনভাবে জামাতে আহমদীয়ার বিরুদ্ধে হামলা বা আক্রমণ তো হয়ে যাক কিন্তু জামাতে আহমদীয়া যেন উত্তর প্রদানের সুযোগ না পায়-এটা চরম পর্যায়ের ভীরুতার চিহ্ন এবং নিজেদের পরাজয়ের শেষ স্বীকারোক্তি যে, আমাদের কাছে কিছুই নেই। একপক্ষে জামাতে আহমদীয়ার সংখ্যা এত কম বলে বর্ণনা করা হচ্ছে ৭০/৮০ হাজারের থেকে বেশি নয়। এদের কোন সামর্থ্য নেই। আর অন্য দিকে ইসলামী আলেমকুলের জন্য এত বড় বিপদ ইতিপূর্বে কখনই আসেনি! আর লিটারেচার বাজেয়াপ্ত করা এবং সমস্ত পদক্ষেপ এবং গৌরব এ কথার ওপর, এ সমস্যার সমাধান আমরা করে ফেলেছি। এভাবে বিগত সরকারের সাথে তাদের পদক্ষেপের ওপর দৃষ্টি রেখে বর্তমান সরকার যে বিশ্লেষিত শ্বেত-পত্র প্রকাশ করেছে তাতে লেখা হয়েছে, সংসদ প্রকৃতপক্ষে খুবই কার্যকর ছিলো। এ সত্ত্বেও জাতীয় সংসদকে তাদের ভেঙ্গে দিতে হয়েছে, পৃথকীকরণ করতে হয়েছে। এ আপত্তির ফলশ্রুতিতে যে, সবাই মন্দ ও অসৎ ইল্লামাশাআল্লাহ্। এ সত্ত্বেও এই কার্যক্রমকে তারা অভিবাদন জানিয়েছে। কেননা, সেখানে লাভের উপকরণ পাওয়া যেত। একই ধরনের কাজ ছিলো। এ জন্য এতো তাদের গ্রহণ করতেই হতো। তারা এটাই গ্রহণ করে যে, সেই সংসদের কার্যক্রম

খুবই আজিমুশ্বান ছিলো। কেননা, শত বর্ষের সমস্যা তারা সমাধান করে দিয়েছে। কিন্তু শত বর্ষের সমস্যা পুরোপুরি সমাধান হয়নি তাদের দ্বারা। কেননা, যে আইন তৈরী করার ছিলো তা আমাদের ভাগ্যে লিখাতো ছিলো। তাই আমরা সেই আইন অবলম্বন করে সবসময়ের জন্য এ জামাতকে মূল থেকে উৎপাটন করে দিয়েছি। সেই সমস্যার কি করে সমাধান হয়েছিল? মুসলমানদের এ বিপদ থেকে কিভাবে রক্ষা করা হয়েছিলো? এর সবশেষে লেখা হচ্ছে, তারা বলে, আমরা এভাবে এ সমস্যার সমাধান করেছি আর এখন ইসলামী আলেমদের এ জামাতের পক্ষ থেকে কোন শংকা নেই, আযান দেয়া বন্ধ করে দেয়া হয়েছে, মুসলমান দাবী করা বন্ধ হয়ে গেছে, কলেমা পড়তেও পারবে না আর লিখতেও পারবে না। মসজিদকে মসজিদ বলতে পারবে না। মুসলমানদের পরিভাষা বা আদব-কায়দা ব্যবহার করতে পারবে না। কুরআন করীমের নির্দেশাবলীর ওপর অনুশীলন বা আমল করতে পারবে না। এখন আমরা খুবই সন্তুষ্ট। কত আজিমুশ্বান মীমাংসা আমরা করছি! পরিশেষে এ দৃষ্টান্ত তারা স্থাপন করেছেন। নির্বুদ্ধিতারও তো একটি সীমা আছে! কিন্তু চালাকীর মাঝেও অনেক সময় বোকামী বা নির্বুদ্ধিতা প্রকাশ পায়। কারণ হচ্ছে, যে লোকের কাছে সত্য বলে কিছু থাকে না, যে চালাকী দ্বারা নিজ উদ্দেশ্য সমাধানের চেষ্টা করে আর সত্যতা না থাকার ফলশ্রুতিতে চালাকীর মধ্যে এক প্রকার নির্বুদ্ধিতা অন্তর্ভুক্ত হয় আর তা আপনা আপনিই প্রকাশিত হয়ে যায়। এ কারণে এ অভ্যন্তরীণ বৈপরীত্য নির্বুদ্ধিতা বোকামী একটি মিথ্যা চালাকীর ফলাফল বা দৃষ্টান্ত। সত্যিকার বুদ্ধিমত্তায় কখনই এ ধরনের বৈপরীত্য পরিলক্ষিত হয় না। মোট কথা এই সরকার এ পদ্ধতি অবলম্বন করছে, নিজে নিজেকে ভূট্টো সরকারের থেকে বেশি চালাক মনে করেছে, যে বলে তার দ্বারা তো বোকামী হয়ে গিয়েছিলো যে, প্রশ্নোত্তরের সুযোগ প্রদান করেছিলো। এভাবেই শ্বেত-পত্রে একথাও লেখা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে যারা নবুওয়তের দাবী করে তাদের সাথে আলাপ-আলোচনা করাই উচিত নয়। দলিল-প্রমাণ দিয়ে তাকে পরাজিত করাই নির্বুদ্ধিতা। এজন্য যে উপায় আমরা অবলম্বন করেছি এছাড়া আর কোন পদ্ধতি নেই। এবং তা সত্ত্বেও সমগ্র বিশ্বে আপত্তি উত্থাপনের ধারা জারী করে দিয়েছে। কিন্তু কুরআন করীম থেকে জানা যায়, যালেমদের কখনোই কোনরূপে লাভবান করে না। ফলাম্মা আযাআত মা হাওলাহু যাহাবাল্লাহু বি নুরীহিম ওয়া তারাকাহুম ফি যুলুমাতিল্লা ইউবসিরুন অর্থাৎ এমন লোক যারা মুনাফিকদের বৈশিষ্ট্য বা স্বভাব অবলম্বন করে দাবী করে এক ধরনের আর তাদের কর্ম হয়ে থাকে অন্য কিছু। হিকমতের মাধ্যমে কথবার্তা বলে আর চরম নির্বুদ্ধিতাপূর্ণ আচরণ বা গন্ডগোল হিকমতের সাথে সাথেই জারি থাকে। তাদের প্রচেষ্টা কখনোই তাদেরকে উপকার পৌছায় না। তারা অবশ্যই আগুনকে প্রজ্জ্বলিত করে দেয় কিন্তু আগুন দ্বারা যে তামাশা দেখতে চায় আল্লাহ্ তাদেরকে সেই তামাশা দেখা থেকে বঞ্চিত করে দেন। তাদের দৃষ্টি-শক্তি ছিনিয়ে নেন বা কেড়ে নেন, তারা আগুনকে প্রজ্জ্বলিত করার জন্যই জ্বালায় কিন্তু সেই আগুন তাদের নিজ নূর বা দৃষ্টি-শক্তি থেকেই তাদেরকে বঞ্চিত করে দেয়। যাহাবাল্লাহু বিনূরিহিম এরপর তাদেরকে এমন অন্ধকারে ছেড়ে দেয় যে, তারা কিছুই দেখতে পায় না। সুতরাং তাদের এই প্রচেষ্টাও কার্যত পরিশেষে জামাতে আহমদীয়ার জন্য লাভের কারণ হয়েছে আর হতে থাকবে। আর প্রকৃতপক্ষে জামাত এমন এক সময়ের আবর্ত অতিক্রম করছে যার সম্বন্ধে কুরআন করীম বলে, আ'যাআন তারকাহু শাইউন ওয়া হুয়া খাইরুল্লাকুম অর্থাৎ ঃ অনেক সময় এরূপ হয়ে থাকে আর তোমাদের সাথেও এরূপ হবে। তোমরা একটি বিষয়কে অপসন্দ করো, তোমাদের হৃদয় ব্যথিত হয়, কষ্ট পায় ওয়া হুয়া খাইরুল্লাকুম কিন্তু পরিশেষে তা তোমাদের জন্য কল্যাণের কারণ হয়ে থাকে। শিশুদেরকে তোমরা তিতা ঔষধ খাওয়াও, টিকা প্রদান কর; তারা চিৎকার -চেঁচামেচী করলে তোমরা হাত ধরে রাখো, কোন অবস্থাতেই তাদেরকে ছাড় দাও না। তোমরা জেনে শুনে শিশুদের সাথে এ আচরণ করো। কেননা, পরিশেষে এতে শিশুর জন্য কল্যাণ বা মঙ্গল রয়েছে। অতএব আমরাও অনেক সময় তোমাদের জন্য এমন কষ্টদায়ক আয়োজন করবো যা তোমাদের একেবারে নিকটবর্তী হবে কিন্তু পরিশেষে তোমাদের জন্য উপকার বা কল্যাণের কারণ হবে।

নির্বুদ্ধিতারও তো একটি সীমা আছে! কিন্তু চালাকীর মাঝেও অনেক সময় বোকামী বা নির্বুদ্ধিতা প্রকাশ পায়। কারণ হচ্ছে, যে লোকের কাছে সত্য বলে কিছু থাকে না, যে চালাকী দ্বারা নিজ উদ্দেশ্য সমাধানের চেষ্টা করে আর সত্যতা না থাকার ফলশ্রুতিতে চালাকীর মধ্যে এক প্রকার নির্বুদ্ধিতা অন্তর্ভুক্ত হয় আর তা আপনা আপনিই প্রকাশিত হয়ে যায়। এ কারণে এ অভ্যন্তরীণ বৈপরীত্য নির্বুদ্ধিতা বোকামী একটি মিথ্যা চালাকীর ফলাফল বা দৃষ্টান্ত। সত্যিকার বুদ্ধিমত্তায় কখনই এ ধরনের বৈপরীত্য পরিলক্ষিত হয় না।

সুতরাং আহমদীয়া জামাতের বিষয়ে পাকিস্তান সরকার সারা বিশ্বে যে লিটারেচার প্রকাশ করেছে এর সবচেয়ে বড় একটি লাভ এই হয়েছে, গোটা বিশ্বের দৃষ্টি জামাতের প্রতি নিবদ্ধ হয়েছে। অনেক লোকের স্বপ্ন আর কল্পনায় ছিলো না , জামাতে আহমদীয়া নামে বিশ্বে কোন জামাতও আছে। তাদের কাছে এ সংবাদ পৌঁছেছে। সারা বিশ্বের পত্র-পত্রিকায় এ বিষয় সংক্রান্ত নোটিশ প্রকাশিত হয়েছে। এবং আহমদীয়ত নিজ প্রসিদ্ধির দৃষ্টিকোণ থেকে, পরিচিতি লাভের দিক থেকে বর্তমানে এ অর্ডিনেন্স জারী হওয়ার পূর্বের তুলনায় কমপক্ষে বিশ ভাগ পরিচিতি বৃদ্ধি পেয়েছে। অর্থাৎ পুরো আমেরিকা আর পুরো ইংল্যান্ডে লোকদের থেকে বিশাল সংখ্যা আপনাদের সম্বন্ধে অনবহিত ছিলো। একটি বা দু'টি মিশনের মাধ্যমে কোটি কোটি জনসংখ্যাকে তো নড়ানোই যেতে পারে না। কোন আগ্রহই অনুভব করতো না। কিন্তু যে অবস্থার মধ্য দিয়ে জামাত অতিবাহিত হয়েছে আর সমস্যায় নিপতিত হয়েছে এর ফলশ্রুতিতে মানুষের সাথে এক প্রকার সহানুভূতির সৃষ্টি হয়েছে আর এ সেই সহানুভূতির ফলশ্রুতিতে জামাতের বিষয়াবলীর প্রতি হৃদয় আকৃষ্ট হয়েছে। লোকেরা জামাতের লিটারেচার পড়তে আরম্ভ করেছে। আর জিজ্ঞেস করতে শুরু করেছে, তোমরা আসলে কি? এ ছাড়া যতটুকু অংশ বাকি ছিলো তা পাকিস্তান সরকারের এ বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ লিটারেচার পূর্ণ করে দিয়েছে। কেননা, তাদের লিটারেচারের ধরন

বা পদ্ধতিই এরূপ, এর ফলে একজন যুক্তিজ্ঞানপূর্ণ মানুষ বুঝে ফেলে, এর ভেতরে নিশ্চয় কোন রহস্য আছে। অবশ্যই এমন কোন বিষয় আছে। কেননা, একদিকে বলছে, জামাতের সংখ্যা তো খুবই সামান্য কয়েক হাজার। শত বছরে সব শক্তি প্রয়োগ করেও ৭০ হাজারের বেশি বৃদ্ধি পায় নি। এদের দ্বারা এত বড় কোটিকোটি সংখ্যার প্রশাসন ভীত হয়ে যায় আর সমগ্র ইসলামী বিশ্বের জন্য শংকার সৃষ্টি করে দিচ্ছ। এত বড় নির্বুদ্ধিতাপূর্ণ কথা সব মানুষতো সহ্য করতে পারে না। এজন্য সেই রচনাকে বা বিষয়কে পড়ার পর নিজেরাই অর্থাৎ এমন লোক যিনি জামাত সম্বন্ধে একেবারেই অনবহিত তার মাঝেও এক প্রকার সহানুভূতি সৃষ্টি হয় এবং কমপক্ষে জানার আগ্রহ সৃষ্টি হয়। এখন এর ফলশ্রুতিতে আল্লাহ্‌তাআলার কৃপায় আমাদের জন্য আরেকটি বিরাট সুযোগের সৃষ্টি হয়েছে যা আমরা পূর্বে হারিয়ে ফেলেছিলাম। তাদের চালাকি উল্টে তাদের ওপর পড়েছে। বিগত সরকার আমাদের যে হাত বেঁধে দিয়েছিলো সে হাত এখন এরা খুলে দিয়েছে। তারা আমাদেরকে উত্তর প্রদানের সুযোগ দিয়েছিল আর পাশাপাশি নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিল, এ প্রশ্নোত্তর তোমরা বিশ্ববাসীকে জানাতে পারবে না। বর্তমান সরকার প্রশ্নগুলো যেখান থেকে চুরি করেছে, আমি তো সেখানে ছিলাম এজন্য আমার জানা আছে সব প্রশ্ন একেবারে জাতীয় সংসদে উঠানো হয়েছিলো। পদ্ধতি এরূপ অবলম্বন করেছে, তা থেকে কিছু শ্বেত-পত্রে অন্তর্ভুক্ত করেছে আর কিছু একটি পুস্তিকায় আসলে তো নোংরা জিনিষ, এরপরও পুস্তিকার আকারে বিখ্যাত "উর্দূ ডইজেষ্ট", জানি না তাকে এরা কত লক্ষ টাকা দিয়েছে, সেই পুস্তিকার পুরোটাতেই হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর বিরুদ্ধে মিথ্যা আপত্তির চরম বেসাতি করে ছাপানো হচ্ছে। অশালীনতার চরমে গিয়ে মূর্খতাপূর্ণ কথাবার্তা কোন ভদ্র বা শালীন লোক পড়ে একদিকে ফেলে দেয়। এমন প্রতারণা, যদি কেউ এতে পাকোড়া বিক্রি করে তাহলে সম্ভবত যিনি খাবেন তিনি পাকোড়াকেও অপবিত্র মনে করে ফেলে দিবেন। অথচ একে একটি মহান আজিমুশ্বান পুস্তিকা হিসেবে তৈরী করে ছাপানো হয়েছে। আর শ্বেত-পত্রে অন্যান্য যেসব আপত্তি বাকি রয়ে গিয়েছিল সেসব এখানে একত্র করা হয়েছে। এটি রীতিমত একটি পরিকল্পনা। এতে কোন কোন আহরারীরা একান্তই ভ্রষ্টতা পূর্ণ নোংরা জিনিস রয়েছে যা বিজ্ঞাপনের আকারে প্রতিনিয়ত প্রকাশিত হচ্ছে। এর দিকে পাকিস্তানের জনগণও পাকিস্তানের সম্ভ্রান্ত-ভদ্র লোকেরা কখনও দৃষ্টিই দেয় না। এতে এতটা গুরুত্ব প্রদান করা হচ্ছে যে, তথ্য মন্ত্রণালয় এসব ক্রয় করে সারা বিশ্বের হাই কমিশনগুলোতে প্রেরণ করছে। এগুলো পড়ার জন্য যেন সেই এসেমব্লির চেতনা । কোন দিন এসে এসেমব্লিতে গিয়ে দেখো না, সেই লিটারেচারের কি পরিণতি, যা তোমরা জামাতের ওখানে পাঠিয়ে থাকো। বর্তমানে তো শীতের মওসুম। অসম্ভব নয়, তারা এগুলো জ্বালিয়ে এ দিয়ে হাত পা গরম করে থাকবে আর এর উত্তম ব্যবহার করে! তাদের নিজেদের বিষয়ে কোন চেতনা নেই, আর অন্যান্য বিষয়ে আগ্রহ! তারা ইউরোপ আমেরিকার বিলাস-ব্যাসন থেকে চোখ বন্ধ করে নিজেদের স্বার্থসমূহ থেকে মুখ ফিরিয়ে জামাতে আহমদীয়ার সম্বন্ধে একতরফা বক্তব্য পড়ার ক্ষেত্রে কেন সময় নষ্ট করবে? আর যারা কূটনৈতিক হিসাবে কাজ করে তারা ভালভাবেই জানে, বহির্বিশ্বের এসেমব্লিতে কি হয় আর এ ধরনের পুস্তিকার গ্রহণীয়তা কতটুকু। আর কেবল ভাসা-ভাসা দৃষ্টিতে দেখে আর শিরোনাম দেখেই বুঝে নেয়। আর জামাতে আহমদীয়ার অস্তিত্ব সম্বন্ধে অবগত হয়ে যায় আর বলে এদিকে দৃষ্টি রাখো। এথেকে বেশি কোন লাভ হয় না। এরপর তা জ্বালানো হয় অথবা কেউ তা গরম করে বা হাত সেঁকে। অতএব তা-ও এখন হচ্ছে। অর্থাৎ এ ধরনের নোংরা ও কুরুচিপূর্ণ অশ্লীল লিটারেচার সরকারী কর্মকর্তাদের মাধ্যমে ক্রয় করে বহির্বিশ্বের এসেমব্লিগুলোতে পাঠানো হয়েছে আর মনে করছে, আমরা মহান কাজ সম্পাদন করছি। অতএব ইনশাআল্লাহ্‌তাআলা এর উত্তর প্রদান করা হবে, উত্তর প্রস্তুত হয়ে গেছে। আর খুতবার সাথে যতটুকু সম্পর্ক এতে এমন অনেক প্রয়োজনীয় বিষয়াবলী সৃষ্টি হয়ে থাকে তখন ধারাবাহিকতা ছিন্ন করা আবশ্যকীয় হয়ে যায় কিন্তু যতটুকু খোদা তৌফীক দিবেন, কিছু অংশ খুতবার আকারে কিছু অংশ তুলনামূলক দীর্ঘ বক্তৃতার আকারে আমি বর্ণনা করবো আর সেই সময় যা যা হস্ত চ্যুত হয়েছিলো, সারা বিশ্বব্যাপী নিজেদের কথামালা বা বাহাস বা বিতর্কের আকারে পৌঁছানো হোক এবং এ কথা বর্ণনা করে পৌঁছানো হোক যে, পাকিস্তান সরকারের এরূপ ছিলো। এই অজুহাত যার কারণে তারা আমাদেরকে কাফির মনে করে বা অমুসলিম মনে করে। সেই অজুহাত তো আমরা বর্ণনাই করতে পারতাম না। কেননা, আইন আমাদের হাত বেঁধে দিয়েছিলো আর আমরা অঙ্গীকার পূর্ণরূপে সম্পাদনকারী। এজন্য আমরা অপারগ ছিলাম, আমরা ছাপাতে পারতাম না। এখন এর উপর সরকারী সত্যায়ন রয়েছে। তাদের বিবরণ তারা বর্ণনা করেছে। এখন আমাদের বিস্তারিত বিবরণ আমরাই বলবো, ইনশাআল্লাহ্‌তাআলা যেভাবে ইচ্ছা বর্ণনা করবো। সমগ্র বিশ্বকে অবগত করবো। সব ভাষায় বর্ণনা করবো। তারা তো এর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতেই পারে না। তাদের কোন সামর্থ্যই নেই। দলিল বা যুক্তির সামনে যদি নত না হতে হতো তাহলে আমাদের দেশেই আমাদেরকে সুযোগ দিতো। দলিল-প্রমাণের সামনে দাঁড়ানোর যদি সাহস থাকতো তাহলে পুস্তকাদি বাজেয়াপ্ত করার কি প্রয়োজন ছিলো, পত্রিকা বন্ধ করার কি দরকার ছিলো? প্রেসসমূহে তালা লাগানোর কি আবশ্যকীয়তা ছিলো? ভীরু জাতি। এদের তো কোনই যোগ্যতা নেই। সামান্য দুঃসাহসও যদি থাকতো তাহলে জামাতকে সুযোগ দিত যেন আমরা উত্তর দিতে পারে। কিন্তু সুযোগতো আমাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে পারবে না। আমরা সর্বত্র এ উত্তর পৌঁছাবো এবং পাকিস্তানেও পৌঁছাবো। এখন সঠিকভাবে দেখো, ইনশাআল্লাহ্‌তাআলা পৃথিবীর কোন শক্তি জামাতে আহমদীয়ার উন্নতিতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারবে না। কেননা, এটি খোদা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত জামাত। বাকি থাকলো বই-পত্র। জামাতে আহমদীয়ার ওপর এ অবস্থা কতদিন বহাল থাকবে? যেভাবে আমি পূর্বেও বলেছি, এ সম্বন্ধে আল্লাহ্‌ই ভাল জানেন, কিন্তু আমি কেবল এতটুকু বলে আজকের খুতবা শেষ করবো। বিভিন্ন লোকের চিঠি-পত্রে কিছু নৈরাশ্যের চিত্র পরিলক্ষিত হচ্ছে। আমাকে অনেক কষ্ট দেয়। নিরাশ হওয়া উচিত নয়। নিরাশ না বলে বরং নৈরাশ্যের পরিবর্তে অন্য কিছু বলা যেতে পারে। কেননা, তারা খোদার রহমত থেকে তো নিরাশ নয় কিন্তু ফলাফল বা দৃষ্টান্ত যা দাঁড় করাচ্ছে তাতে অত্যন্ত দ্রুততা করা হচ্ছে, তাড়াহুড়োর দ্বারা কাজ করা হচ্ছে। তারা এটা মনে করে, বর্তমানে এ অবস্থা অতীতের মোখালেফাতের তুলনায় এ দৃষ্টিকোণ

থেকেও পৃথক। এখন সম্ভবত এ দেশ থেকে আমাদের কেন্দ্রকে হিজরত বা স্থানান্তরিত করতে হবে। সমস্যাবলীর একটি দীর্ঘ সময়! এর সাথে সাথে এ বিশ্বাসও রাখে, এর ফলশ্রুতিতে মহান বিজয় আসবে যা সর্বদা হয়ে এসেছে। কিন্তু তারা খুব তরিৎ এ ফলাফল বের করছে। আমি কোনক্রমেই এ ফলাফলের ওপর সন্তুষ্ট নই। ইতিহাস বারবার পুনারাবৃত্ত হয় কিন্তু এটা আবশ্যক তো নয় যে, অক্ষরে অক্ষরে পুনরাবৃত্তি হবে। সেই আকৃতি আর সেই নাম নিয়েই শতভাগ প্রকাশিত হতে হবে। পুনরাবৃত্তি হয় তো নীতিগতভাবে। আর যেই নীতিকে কুরআন শরীফ সংরক্ষিত করেছে সেই নীতি বা পদ্ধতির অবশ্যই পুনরাবৃত্তি হবে। কেননা, তাকে সুন্নতুল্লাহ্ বা আল্লাহ্‌র সুন্নত বলা হয়েছে আর পরবর্তীতে নবীদের সুন্নতে পরিণত হয়। কিন্তু রীতি-নীতির চিত্র বিভিন্ন হতে পারে যেভাবে তা কার্যত প্রকাশিত হবে। এর আকৃতি পরিবর্তিত হতে পারে। এ সিদ্ধান্ত করে নেয়া যে, এখন ঘটনা এভাবে প্রকাশিত হয়ে গেছে। যতক্ষণ আল্লাহ্‌তাআলা নিজে বিস্তারিতভাবে বলে না দেন অথবা নিয়তি বা তকদীর একেবারে সূক্ষ্মরূপে প্রকাশিত না হয়, যাকে গ্রহণ না করে উপায় থাকে না, তা না হলে এক্ষেত্রে দ্রুততা বা তাড়াহুড়া করা উচিত নয়। খোদার পক্ষ থেকে যে কোন তকদীরই বা নিয়তিই হোক না কেন আমরা তা ভয় করি না। খোদার পক্ষ থেকে নির্ধারিত কোন নিয়তিতে আমরা অসন্তুষ্ট হতে পারি না। কিন্তু এ সত্ত্বেও আমি আপনাদেরকে এজন্যে গুরুত্বারোপ করছি আপনারা এ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে তাড়াহুড়ো করবেন না। কারণ যখন আপনারা এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন তখন আপনাদের দোয়ায় দৃঢ়তার ক্ষেত্রে ঘাটতি এসে যাবে। আপনাদের দোয়ায় অধৈর্য পরিলক্ষিত হবে আর আপনারা মনে করবেন বিষয়টি অনেক দীর্ঘ হবে। কোনই পার্থক্য হবে না। এরূপ হয়েই থাকে। আর তাদের উদ্বিগ্ন আর ব্যাকুলতাপূর্ণ যে দোয়া ছিলো এতে তীব্রতা আর থাকবে না। এটা অনেক বড় ক্ষতি। এজন্যই তকদীর তা-ই হবে যা খোদাতাআলার তকদীর। আপনারা তা পরিবর্তন করতে পারেন না। কিন্তু আপনাদের দোয়া এবং প্রার্থনার আশা-আকাঙ্ক্ষাকে কেন নিচু করছেন। সৈন্য তো সে-ই হয়ে থাকে, যে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত যুদ্ধের ময়দানে লড়তে থাকে আর বুক পেতে গুলি নেয়। অতএব আমরা খোদার তকদীরের সাথে লড়াই করতে পারবো না। খোদার তকদীর নিজেই আমাদেরকে স্বীয় তকদীরের মোকাবেলা করার একটি পন্থা শিখিয়েছে আর তা হচ্ছে কাতরতাপূর্ণ দোয়া। কাতরতাপূর্ণ দোয়ার তকদীরও এক ভিন্ন তকদীর। এটা কাজ করে যাচ্ছে। আল্লাহ্‌তাআলা বলেন, অনেক সময় এ ধরনের তকদীরও এরূপ শক্তিশালী হয়ে যায়, ফলে আমি আমরা অন্য তকদীরে পরিবর্তন করে থাকি আর দোয়ার তকদীরকে জয়যুক্ত করে দেই। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) যে বিস্ময়কর অলৌকিক ঘটনা আরবে সংঘটিত হয়েছিলো বলে বর্ণনা করেছেন তা এরূপই।

আঁ হযরত (সঃ)-এর সাথে তাঁর জাতি যে ব্যবহার করেছিলো এর ফলাফল তো এরূপ হওয়াই উচিত ছিলো, গোটা জাতি ধ্বংস হয়ে যেতো আর তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হতো। সেই লোকেরা জাতির তুলনায় অনেক বেশি শাস্তি পাওয়ার যোগ্য ছিলো। বিরুদ্ধবাদীর একজন মানুষকেও ছাড় দেয়া যেত না। পরে যে ঘটনা সংঘটিত হয়েছে আর আল্লাহ্‌তাআলা ফিরিশ্‌তাদের মাধ্যমে আঁ হযরত (সঃ)-কে সংবাদ দিলেন এতো হিকমত বা প্রজ্ঞা ছিলো। এটা প্রকাশ করা হয়েছিলো। প্রত্যেক মন্দ আচরণের ফলে খোদার তকদীর এটাই কামনা করে যে, তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়া হোক। কিন্তু হে মুহাম্মদ! তোমার হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষাও খোদার কাছে একটি তকদীর সৃষ্টি করছে। তোমার কাতরতাপূর্ণ দোয়া আশা-আকাঙ্ক্ষাও খোদার কাছে একটি তকদীর তৈরি করছে আর তা-ও খোদার তকদীরেরই একটি অংশ। আমার কাছে তোমার আবেগ ও দোয়া অন্যান্য সকল প্রকার তকদীরের তুলনায় বেশি মূল্য রাখে। এজন্য তোমার ইচ্ছা বহির্ভূত, তোমাকে জিজ্ঞেস না করে এ জাতির সাথে আমি কি আচরণ করবো, আমি আমার অন্য তকদীর প্রকাশ করবো না। দ্বিতীয় তকদীর কি ছিলো, তা হচ্ছে, তোমার হৃদয় যদি কামনা করতো, আর তুমি এতটাই অসন্তুষ্ট ও দুঃখিত হবে যে, এদের ধ্বংসের লক্ষ্যে প্রস্তুত হয়ে গেছো তাহলে আমি আমার ফিরিশ্‌তাদেরকে নির্দেশ দিবো আর তারা এ দু'টি পাহাড়কে এমনভাবে এক করে দিবে যে, সবসময়ের জন্য তায়েফের জনপদ বিশ্বে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। এটি একটি ছোট্ট ঘটনা ছিলো। খোদাতাআলার গোপন তকদীর প্রকাশিত হওয়ার ফলে এটা আমাদের দৃষ্টিতে এসেছে। কিন্তু আঁ হযরত (সঃ) কেবল সেই সময়েই খোদার প্রিয় ছিলেন না, কেবল মাত্র সেই একটি সময়ের পালাই ছিলো না যখন তিনি খোদার পথে কষ্ট সহ্য করেছেন বরং সর্বত তার হৃদয়ে একটি কেয়ামতের ভাঙ্গন হতো। প্রতিদিন তিনি খোদার খাতিরে নিজ প্রাণকে উৎসর্গ করতে থাকেন কুল ইন্নাস্ সলাতী ওয়া নুসুকি ওয়া মাহ্‌ইয়ায়া ওয়া মামতী লিল্লাহি রব্বিল আলামীন। তিনি তো প্রতিদিন খোদার জন্য মৃত্যুবরণ করতেন, আর প্রতিদিন খোদার পক্ষ থেকে জীবন লাভ করতেন। এজন্য এটা সেই তকদীর যা ধারাবাহিকভাবে জারী ছিলো,আর এর মোকাবিলায় তাঁর দোয়াও নিয়মিত জারী ছিলো। আর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেন, পরিশেষে হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সঃ)-এর দোয়ার তকদীর জয়যুক্ত হয়েছে এবং আকাশে গৃহিত হয়েছে আর এ জাতি যাদের ললাটে ধ্বংস নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিলো তাদেরকে সবসময়ের জন্য জীবন প্রদান করা হয়েছে।

কিন্তু হে মুহাম্মদ! তোমার হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষাও খোদার কাছে একটি তকদীর সৃষ্টি করছে। তোমার কাতরতাপূর্ণ দোয়া আশা-আকাঙ্ক্ষাও খোদার কাছে একটি তকদীর তৈরি করছে আর তা-ও খোদার তকদীরেরই একটি অংশ। আমার কাছে তোমার আবেগ ও দোয়া অন্যান্য সকল প্রকার তকদীরের তুলনায় বেশি মূল্য রাখে।

আপনারা সেই মালিকের বা নেতার দাস হওয়ার দাবীদার। তাঁর পদাঙ্কই অনুসরণ করুন। এ জাতির ধ্বংসের জন্য তাড়াহুড়ো করবেন না বরং এ জাতির উদ্ধারের বা মুক্তির জন্য আকঙ্ক্ষা প্রকাশ করুন। খোদা করুন যেন এমনই হয়। আর অতি দ্রুত এ জাতি বুঝতে পারে। আমার ব্যক্তিগত অভিমত হচ্ছে, আমি মনে করি ১৯৮৪ আহরারীদের বছর ছিলো আর ১৯৮৫ জামাতে আহমদীয়ার বছর প্রমাণিত হবে, ইন্‌শাআল্লাহ্।

(লন্ডন থেকে অডিও ক্যাসেট থেকে শ্রুত ও অনূদিত)

অনুবাদ- **মৌলবী আহমদ তারেক মুবাশ্বের**

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর চিঠি-পত্র

(মকতুবাতে আহ্মদীয়া, ৫ম খন্ড)

সংকলক– হযরত ইয়াকুব আলী ইরফানী (রাঃ)

(সপ্তম কিস্তি)

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আওওয়াল (রাঃ) এর নামে

পত্র নং ৩৪

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম

নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি আলা রাসূলিহিল কারীম

শ্রদ্ধেয়, সম্মানিত প্রিয় ভ্রাতা 'মাজ্‌যুবুল হক্ক ও মাওরাদে ইহ্‌সানাতে ইলাহীয়া' (–হক্ তাআলায় আত্মবিভোর ও ঐশী অনুগ্রহরাজির আধার মৌলবী হেকীম নূরুদ্দীন সাহেব–অনুবাদক) সাল্লামাহুতাআলা!

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

মৌলবী নূরুদ্দীন সাহেবকে দ্বিতীয় বিয়ের জন্য উৎসাহ দান ও সন্তান লাভের ভবিষ্যদ্বাণী ঃ

যখন থেকে এ অধম আপনার সাথে সাক্ষাৎ করে ফিরে এসেছে, তখন থেকে আমি আপনার দুঃখ-বেদনা ও বিষন্নতা সম্পর্কে চিন্তান্বিত হয়ে আছি, আর আমার অন্তর বড়ই আত্মবিশ্বাসের সাথে এ রায় দেয় যে হযরত দ্বিতীয় বিয়ের হৃদয়গ্রাহী-যুৎসই ব্যবস্থা হয়ে গেলে তা প্রভূত কল্যাণ ও আশিসের কারণ হবে। আমি আশা করি, এতে অবসাদ ও বিষন্নতাও দূর হয়ে যাবে এবং আল্লাহ্ জাল্লাশানুহু নিজ কৃপায় ও অনুগ্রহে আশিসমন্ডিত দীর্ঘজীবি সুসসন্তানও দান করবেন। কিন্তু স্ত্রী এমন হওয়া চাই যার সাথে পারস্পরিক মিল-মিশ ও আনুকুল্য সম্পর্কে পূর্বাহ্নেই নিশ্চিত হওয়া যায়।

সৌভাগ্যশালী ও পুণ্যবান কে ঃ

অতি সৌভাগ্যশালী ও পুণ্যবান সেই ব্যক্তি, যে পুণ্যবতী ও প্রীতিভাজন স্ত্রী (জীবনসঙ্গীনী হিসেবে) পেয়ে যায়। কেননা এতে করে তাকওয়া-তাহারত সুপ্রতিষ্ঠিত হয় এবং ধর্ম ও ধর্মপরায়ণতার এক বৃহদাংশ অনায়াসে লাভ হয়। এ কারণেই সতী-সাধ্বী ও সুশ্রী-সুন্দরী স্ত্রী প্রাপ্তির দিকে প্রায় সকল নবী ও রসূলের দৃষ্টি সদা নিবদ্ধ থাকে–এমন স্ত্রী যাদের সাথে তাদের যেন এক ধরণের প্রেম-প্রীতির সম্পর্ক হয়। আমাদের নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর সাথে ভালবাসার এক প্রসিদ্ধ ঘটনা রয়েছে এবং লেখা আছে যে, ইসলামে সর্ব প্রথম সে ভালবাসাই অনুষ্ঠিত হয়।

অতএব, আমি আপনার জন্যে দোয়া করি, সর্বপ্রথম আল্লাহ্ জাল্লাশানুহু আপনাকে এ নেয়ামত দান করুন। আমার মতে প্রত্যেক নেয়ামতই বেশির ভাগ নেয়ামতের উৎসমূল হয়ে থাকে। আর মু'মিন যেহেতু অতি উচ্চ পর্যায়ের তাকওয়ার প্রত্যাশী ও অভিলাষী বরং এর প্রেমিক ও উদগ্রীব হয়ে থাকে, কাজেই আমার মতে মু'মিনের জন্য এ বিষয়ের অন্বেষণ বাধ্যকর বিষয়াবলীর অন্তর্ভুক্ত। আমার দৃষ্টিতে সেই গৃহ বেহেশ্‌তের ন্যায় পবিত্র এবং বরকত ও আশিসে ভরপুর, যে গৃহে স্বামী ও স্ত্রীর মাঝে ভালোবাসা, আন্তরিকতা এবং পারস্পরিক আনুকুল্য ও মিল মিশ থাকে। এবার মোদ্দা কথা এই যে, এ নেয়ামতের জন্যে অতিসত্তর চিন্তা-ভাবনা ও চেষ্টা-প্রয়াস আবশ্যক আর আপনি যে মৌখিকভাবে বলেছিলেন, আপনার পরিবার-পরিজনের মাঝে এক জায়গা বিবেচনাধীন রয়েছে, সে সম্পর্কে আপনি ভালভাবে অনুসন্ধান করুন। সেখানটি যদি পছন্দনীয় ও গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত না হয়, তবুও অবশ্যই অবগত করবেন,যাতে বিভিন্ন স্থানে নিজ বন্ধুদের দিয়ে (পাত্রী) তালাশ করা যায়। দ্বিতীয়ত এক গোছানোর যোগ্য এ বিষয়টিও রয়েছে যে, আপনার খরচাদি এমন সীমা ছাড়িয়ে যে এর দরুন সব সময় আপনাকে রিক্ত হস্তে থাকতে হয়। এমন কি আমি মৌলবী করীম বখ্‌শ সাহেবের জবানি শুনেছি, যে আটশ' টাকা আপনি আমাকে পাঠিয়েছিলেন তাও দার করে পাঠিয়েছিলেন। কাজেই এ ক্ষেত্রে "লা তাব্‌সুতহা কুল্লাল বাস্‌ত" অর্থাৎ 'তোমার 'খরচের হাতকে একবারে প্রসারিতও করে ফেলে না'–সূরা বনি ইসরাঈল ঃ ২১–অনুবাদক)-এর দিকেও লক্ষ্য থাকা চাই। আর আপনি নিজ অন্তরে এক দৃঢ় অঙ্গীকার করে ফেলুন যে, বেতনের তৃতীয়াংশ বা চতুর্থাংশ ব্যয় করবেন, আর অবশিষ্ট কোন দোকান ইত্যাদিতে জমা করিয়ে দিবেন। আশা করি, এসব বিষয় সম্বন্ধে আপনি আমাকে অবগত করবেন। এখানে সার্বিকভাবে কুশলে আছি।

ওয়াস্‌সালাম।

বিনীত
গোলাম আহমদ
কাদিয়ান, ২২ ফেব্রুয়ারী ১৮৮৮ইং

পত্র নং ৩৫

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম

নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি আলা রাসূলিহিল কারীম

শ্রদ্ধেয়, সম্মানিত প্রিয় ভ্রাতা মৌলবী হেকীম নূরুদ্দীন সাহেব (সাল্লামাহুতাআলা)

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

আপনার দুটো পত্রই পেয়েছি। 'ক্বাদের যুলজালাল' (–সর্বশক্তিমান, মহামর্যাদা ও প্রতাপশালী) খোদা আপনার সাথী হোন এবং আপনার কল্যাণজনক সকল উদ্দেশ্য, সফলে আপনার সহায় হোন। এ অধম জনাবের দ্বিতীয় বিয়ের জন্য প্রস্তাব করার উদ্দেশ্যে কয়েক জায়গায় পত্র পাঠিয়েছিল। একটি জায়গা থেকে যে উত্তর এসেছে তা ঈপ্সিত লক্ষ্যের অনুকূল বলে মনে হয় অর্থাৎ মীর আব্বাস আলী সাহেবের চিঠি। এটি আপনার খিদমতে পাঠানো হলো। এ চিঠিতে একটি অদ্ভুত ধরনের শর্তের উল্লেখ রয়েছে ঃ "তিনি (অর্থাৎ) পাত্র যেন হানাফী মাযহাবের অনুসারী হন,'গায়র মুকাল্লিদ' না হন।" যেহেতু মীর সাহেবও হানাফী, এবং আমার আন্তরিক বন্ধু মুনশী আহমদ জান সাহেব (খোদাতাআলা তাঁকে নিজ রহমতে আচ্ছাদিত করুন) যাঁর বরকতমন্ডিত কন্যার সাথে এই প্রস্তাব চলছে, তিনি একজন পাকাপোক্ত খাঁটি হানাফী ছিলেন আর এ অঞ্চলে বিপুল সংখ্যায় বিস্তৃত তাঁর মুরিদও সবাই হানাফী। কাজেই হানাফীয়াতের শর্ত জুড়ে দেয়া হয়েছে। এমনিতে মুসলমান সবাই 'হানাফী মুসলিম'-এর অন্তর্ভুক্ত, তবু এ জবাব টিও যুক্তি যুক্তভাবেই দেয়া উত্তম।

হযরত মুনশী আহমদ জান মরহুম সম্পর্কে ঃ

এবার আমি মুনশী আহমদ জান সাহেবের অল্প একটু জীবন বৃত্তান্ত শুনাচ্ছি। মরহুম মুনশী সাহেব প্রকৃতপক্ষে দিল্লির অধিবাসী ছিলেন। সম্ভবত ১৮৫৭ইং সালের দাঙ্গার সময় লুধিয়ানা এসে বসবাসরত হয়েছেন। তাঁর সাথে আমার কয়েকবারই

দেখা-সাক্ষাৎ হয়েছে। অতি বুজুর্গ, সুদর্শন, সুচরিত্রের পবিত্রচেতা, মুত্তাকী, খোদাভক্ত ও খোদা নির্ভরশীল মানুষ ছিলেন। আমাকে এত ভালবাসতেন ও এত বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করতেন যে, অনেক সময় তাঁর মুরীদগণ ঈঙ্গিতে এবং প্রকাশ্যেও (তাঁকে) বুঝিয়েছে যে, এতে তাঁর মর্যাদা ক্ষুন্ন হয়। কিন্তু তিনি তাদেরকে পরিষ্কার জবাব দিয়েছেন, কোন মর্যাদার প্রতি আমার অভিলাষ নেই এবং মুরীদদের প্রতিও আমার কোন অভিলাষ নেই।' এতে তাঁর কয়েকজন হতভাগ্য অযোগ্য খলীফা তাঁর প্রতি বিরূপ ভাবাপন্নও হয়ে পড়ে। কিন্তু তিনি যে আন্তরিক নিষ্ঠা ও ভালবাসার পথে পা বাড়িয়ে ছিলেন ও সুসম্পর্ক গড়েছিলেন এতে তিনি জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সুপ্রতিষ্ঠত থাকেন এবং তাঁর সন্তানদেরকেও একই উপদেশ দান করেন। আমরণ খিদমত করতে থাকেন এবং দ্বিতীয় কি তৃতীয় মাসে আল্লাহ্‌র দেয়া নিজ জীবিকা থেকে কিছু পরিমাণ টাকা পাঠাতে থাকেন। আর আমার নামের (তথা আদর্শের) প্রচারে প্রাণপণ সচেষ্ট থাকেন। তারপর হজ্বে যাওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন। আর যেভাবে তিনি নিজের ওপর দায়িত্ব অবধারিত করে রেখেছিলেন, যাবার বেলায়ও পঁচিশ টাকা পাঠালেন এবং (আমাকে) এক দীর্ঘ ও বেদনাত্মক চিঠি লিখলেন, যা পাঠ করলে কান্না আসতো। আর হজ্ব থেকে ফেরার পথেই অসুস্থ হয়ে পড়লেন এবং বাড়ী পৌছা মাত্রই মারা গেলেন। **'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।'** নিঃসন্দেহে মুন্শী সাহেব খোদাপ্রদত্ত নিজ বাহ্যিক জ্ঞানগরিমা, সুবক্তব্য, বাগ্মিতা, সৌন্দর্য ও প্রভাব-প্রতিপত্তি ছাড়াও খাঁটি ও সত্যবাদী মু'মিন এবং সৎ-সালেহ্ ব্যক্তি ছিলেন। এ শ্রেণীর মানুষ দুনিয়াতে সংখ্যায় খুব কম দেখতে পাওয়া যায়। তিনি উঁচুমানের ভাব-ধারণার অধিকারী এবং প্রকৃত সূফী ছিলেন বিধায় তাঁর মাঝে পক্ষপাতিত্বমূলক গোঁড়ামী ছিল না। আমার সম্পর্কে তিনি ভালভাবে জানতেন যে আমি হানাফী তকলীদ তথা গতানুগতিকতায় কায়েম ও এর পক্ষপাতি নই এবং একে পছন্দও করি না। কিন্তু তবুও এ খেয়াল তাঁকে (আমার প্রতি) ভালবাসা, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার পথে বাধা দিতো না। মোট কথা, এই হচ্ছে মরহুম মুনশী আহমদ জান সাহেব সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত কিছু বৃত্তান্ত। আর কন্যার ভাই সাহেবযাদা ইফতিখার আহমদ সাহেবও একজন সৎ সালেহ ব্যক্তি এবং তিনি তাঁর মরহুম পিতার সাথে হজ্বও করে এসেছেন। এখন দু'টি বিষয় তদ্বীর সাপেক্ষ ঃ প্রথমত, তাঁদের হানাফিয়াত সংক্রান্ত প্রশ্নের কী উত্তর দেয়া যায়। দ্বিতীয়ত, এই মিল ও সম্বন্ধ সূত্রের ভিত্তিতেই যদি উভয় পক্ষের সম্মতি সাব্যস্ত হয় তাহলে কন্যার বাহ্যিক অবয়ব সম্পর্কেও কোন না কোন ভাবে অবগত হয়ে যাওয়া উচিত। সবচেয়ে উত্তম তো হচ্ছে (মেয়েকে) স্বচক্ষে দেখে নেওয়া কিন্তু আজকাল প্রচলিত পর্দা প্রথা পালনে বড় ধরণের এ দোষ রয়েছে যে, তারা এ (সরাসরি কন্যাকে দেখার) বিষয়টিতে সম্মত হবেন না। আমার কাছে মীর আব্বাস আলী সাহেব নিজ প্রশ্নাবলী সম্বলিত চিঠির যথাশীঘ্র উত্তর চেয়েছেন। তাই আপনার পক্ষ থেকে যেন যথা সম্ভব শীঘ্র উত্তর পাঠানো হয়, সে দায়িত্ব আমার ওপর বর্তায়। এখনও আমি খোলাসা করে আপনার নাম তাদের কাছে প্রকাশ করি নি। (আপনার পক্ষ থেকে) উত্তর আসার পর প্রকাশ করবো।

হিন্দু ছেলেটির বিষয়ে আমার খেয়াল আছে। তবে এখনও দোয়ায় মনোনিবেশ করি নি। কেননা (আপনাকে দেখে) ফিরে আসার দিনটি থেকে শারীরিক অবস্থা ভাল নয়। অসুস্থতা কিছু না কিছু লেগেই আছে। আর তা ছাড়া অতি কর্ম ব্যস্ততা রয়েছে। কিন্তু কোন সময় আমি যদি দোয়ায় মনোনিবেশ করি আর এতে আপনার মতের অনুকূলে অথবা প্রতিকূলে কিছু প্রকাশিত হয় –যে সম্পর্কে আমি এখনও কিছুই জানি না, তাহলে অবশ্যই আপনার পক্ষে তদনুযায়ী পালন করা আবশ্যকীয় হবে।

মির্যা মোহাম্মদ ইউসুফ বেগ মরহুম ঃ

পাটিয়ালা স্টেটের সামানা নিবাসী আমার এক বন্ধু মির্যা মোহাম্মদ ইউসুফ বেগ একটি 'মাজুন' (অবলেহ ঔষধ) কয়েকবার তৈরী করে আমাকে পাঠিয়েছেন। এতে রয়েছে প্রক্রিয়াজাত কুচিলা। আমার অভিজ্ঞতায় এ ওষুধটিকে শিরাতন্ত্রী, মস্তিষ্ক ও পাকস্থলীর শক্তি বৃদ্ধিতে অতি উপকারী হিসেবে পেয়েছি। এটি কাঁপুনী ও পক্ষাঘাত জাতীয় রোগেও অত্যন্ত উপকার করে থাকে। দীর্ঘকাল থেকে এটি আমার ব্যবহারে রয়েছে। আপনি যদি এটি ব্যবহার করা সমীচীন মনে করেন তাহলে এর কিছু পরিমাণ যা আমার কাছে আছে, পাঠাতে পারি।

ছয় শ' টাকার বিষয়ে যে জনাব লিখেছেন এর প্রয়োজন তো অবশ্যই রয়েছে। কিন্তু আপাতত আপনার কাছেই এ টাকা আমানত স্বরূপ রাখুন। আপনার খরচের আওতা থেকে পৃথক করে রাখাই সমীচীন হবে, যাতে আমার প্রয়োজনে অনতিবিলম্বে তা আপনি পাঠাতে পারেন। কিন্তু এখনই পাঠাবেন না। চাহিদার ক্ষেত্রে আমার চিঠি পৌঁছুলে পাঠাবেন।

লেখরামের পুস্তকের খন্ডনে পান্ডুলিপি যদি শীঘ্র তৈয়ার হয়ে যায় তাহলে খুবই ভাল হয়। মানুষ এর জন্য অত্যন্ত অপেক্ষমান রয়েছে। দিল্লিতে মুদ্রণস্থ আপনার পুস্তকটি যদি সম্পূর্ণ ছেপে গিয়ে থাকে তাহলে অনুগ্রহপূর্বক এরও এক কপি পাঠাবেন। 'মনসুরে মুহাম্মদী' পত্রিকায় জনাবের যে প্রবন্ধ ছাপিয়েছেন এর সব সংখ্যাই পৌঁছে গেছে। এটি এক অতি উত্তম প্রবন্ধ। 'জাযাকুমুল্লাহু খাইরা'।

বিনীত
গোলাম আহমদ
কাদিয়ান ২৩ জানুয়ারী ১৮৮৮ইং

পত্র নং ৩৬

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম

নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি আলা রাসূলিহিল কারীম

শ্রদ্ধেয়, সম্মানিত প্রিয় ভ্রাতা মৌলবী হেকীম নূরুদ্দীন সাহেব (সাল্লামাহুতাআলা)

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

অপেক্ষায় থাকার মুহূর্তেই আপনার পত্রখানা পৌঁছুল, পত্রটি লেখছিলাম মাত্র। তখন একই ডাকে আগত বাবু ইলাহী বখ্‌শ সাহেবের পত্র পড়ে অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত-উদ্বিগ্ন হলাম, কেননা এতে লিখা ছিল যে, আপনি চিকিৎসা করাতে লাহোর গিয়েছিলেন এবং ডাক্তারগণ বলেছেন, কমপক্ষে পনের দিন পর্যন্ত তাঁরা সবাই মিলিতভাবে রোগ নির্ণয়ে পর্যবেক্ষণ করবেন তবে গিয়ে রোগের প্রকৃত স্বরূপ জানা যাবে। কিন্তু আপনার পত্র খোলায় কিছুটা উদ্বেগ নিরসন হলো। তবুও দুশ্চিন্তা থেকেই গেল। কেননা (এ চিঠি অনুযায়ী) রোগ তো সম্পূর্ণ নিরাময় হয়ে গিয়েছিল; কেবল দুর্বলতা অবশিষ্ট ছিল। তবে আবার ডাক্তারদের স্মরণাপন্ন হবার কারণ কী? হয়তো কোন দুর্বলতা ইত্যাদির দিক দিয়ে দূরদর্শিতা স্বরূপ তা সমীচীন বলে বিবেচিত হয়ে থাকতে পারে। আমার মতে আপনি যথাসম্ভব বেশি দুশ্চিন্তা ও দুঃখবোধকে পরিহার করুন। কেননা এতে দুর্বলতা বৃদ্ধি পায়। আর অত্যন্ত প্রশান্তি দায়ক হচ্ছে এ আয়াতে করীমাঃ **"আলাম তা'লাম আন্নাল্লাহা আলা কুল্লে শাইয়িন ক্বাদীর"** (–'তুমি কি জান না, নিশ্চয় আল্লাহ্ সব বিষয়ে সর্বক্ষম?'–অনুবাদক)।

দ্বিতীয় বিয়ের জন্য তাগাদা ঃ

আপনি যেন দ্বিতীয় বিয়েকে আর হাল্‌কা দৃষ্টিতে না দেখেন এ বিষয়টি আমার মতে অতি জরুরী হয়ে পড়েছে। বরং একে অবসাদ ও দুঃখ-বেদনাবোধ দূর করার উদ্দেশ্যে জরুরী বলে জ্ঞান করুন। আর আল্লাহ্‌তাআলার অপার অনুগ্রহক্রমে এ আশাও রয়েছে যে, তিনি আপনাকে দ্বিতীয় বিয়ের মাধ্যমে সৎ-সালেহ্ সন্তান-সন্ততি দান করবেন। *(চলবে)*

অনুবাদ– **মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ**
মুরব্বী সিলসিলাহ্

কিংবদন্তি মহাপুরুষ হযরত মির্যা তাহের আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে:)

(তৃতীয় কিস্তি)

হুযূরের এ মোবারক সফরে সমগ্র ভারতের জামাতগুলোর মাঝে এক বিরাট জাগরণ পরিলক্ষিত হয়। যার বহিঃপ্রকাশ আমরা দেখতে পাই ১৯৯৩ সাল থেকে আর্ন্তজাতিক বয়াতের তাহ্রীকে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের কোটি-কোটি মানুষের আহমদীয়াত গ্রহণের মধ্য দিয়ে। হুযূর (রাহে:) যে মূহূর্তে কাদিয়ান সফর করেন সে মূহূর্তে ভারতের পাঞ্জাব ছিল রাজনৈতিকভাবে অশান্ত একটি রাজ্য। স্বাধীন খালীস্তান গঠনের লক্ষ্যে শিখদের একটি অংশ সসস্ত্র যুদ্ধ অব্যাহত রাখার কারণে পাঞ্জাব ও এর আশে-পাশে প্রতিনিয়ত রক্তপাত ছিল এক নিত্ত নৈমত্তিক ঘটনা। হুযূরের এ মোবারক সফরের পরে অলৌকিকভাবে পাঞ্জাবের দীর্ঘদিনের রক্তক্ষয়ী সংঘাতের অবসান ঘটে। হুযূরের কাদিয়ান সফরকালে পাঞ্জাবসহ ভারতীয় নেতৃবৃন্দ যে আন্ত রিক শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছেন তার উদাহরণ বিরল। একইভাবে দীর্ঘ বিরতির পরে স্বীয় জন্মস্থানে আসতে পেরে হুযূরও ছিলেন আনন্দে উদ্বেলিত। শৈশব-কৈশর আর যৌবনের বিভিন্ন স্মৃতির সাক্ষাৎ রোমন্থন হুযূরকে করেছিল পরিতৃপ্ত। এ সংক্ষিপ্ত কাদিয়ান অবস্থানকালে হুযূর নিয়মিত কাদিয়ানের বিভিন্ন ঐতিহাসিক স্থান পরিদর্শনসহ কাদিয়ানের অবকাঠমোগত উন্নয়নের জন্য বিশেষভাবে দীর্ঘমেয়াদী নির্দেশনা দেন; যার বাস্ত বায়ন আজও চলছে। অপরদিকে হুযূরের কাদিয়ান আগমনে দরবেশানে কাদিয়ান আর কাদিয়ানের আপামর জনগণের মাঝে খুশির বন্যা বয়ে যায়। নিজেদের মানুষকে অপ্রত্যাশিতভাবে কাছে পেয়ে তারা যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেয়ে যায়। কাদিয়ানের পথে-পথে মিছিল আর উল্লাস করে হুযূরকে স্বাগত জানানোর জোয়ার বইছিল। এমনকি অন্যান্য জাতি বিশেষকরে শিখদের বাড়ির সামনে হুযূরের বিশাল ছবি টাঙ্গিয়ে তারাও হুযূরের প্রতি তাদের ভালবাসা ও শ্রদ্ধা প্রকাশ করছিল। খলীফাতুল মসীহ্-এর কাদিয়ান আগমনে অ-মুসলিম বাসিন্দারা এতোটাই আনন্দিত হয়েছিলেন যে, তাদের কেউ কেউ অশ্রুসিক্ত আহ্বান জানান: 'হুযূর আপনি আর ফিরে যাবেন না। আপনার অবস্থানে কাদিয়ান ধন্য হবে'। কাদিয়ান প্রদক্ষিণকালে কেউকেউ হাতজোড় করে হুযূরকে তাদের গৃহে পদধুলী দেয়ার আবেদন জানান। আবার কেউকেউ হুযূরকে দুধ পান করিয়ে তৃপ্ত হতেন।

বিহারের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্থ মুসলমানদের জন্য 'তাহেরাবাদ' নামে একটি পল্লী বানানো হয়েছে। একথা জানার পর হুযূর নির্দেশ দেন: "ক্ষতিগ্রস্থ হিন্দুদের জন্যও যেন 'কিষাণনগর' নামে একটি পল্লী বানানো হয়"। হুযূর (রাহে:) তাঁর জলসার ভাষণে এ প্রেক্ষিতে অনুভূতি ব্যক্ত করে বলেন: 'সেবা কেবল সেবার উদ্দেশ্যেই হওয়া উচিৎ। রিলিফের সাথে যেন লিটারেচার বিতরণ না করা হয়। আর রিলিফ বিতরণকালে যেন কেউ জাতি-ধর্ম বিচার না করে'। তিনি আরো বলেন :'যে ধর্ম মানবতার শিক্ষা দেয় না সে ধর্ম ধর্মই নয়'। হুযূর শিখ ও হিন্দু ধর্মশাস্ত্র থেকে তৌহিদ ও মানবতার বিষয়ে কয়েকটি বাণী উদ্ধৃত করে ইসলামের মহান শিক্ষার সাথে এগুলোর সামঞ্জস্য তুলে ধরেন। হুযূর বলেন:'সকল ধর্মের মূল শিক্ষা এক ও অভিন্ন। মানুষ তাতে বিকৃতি ঘটালেও আজো গীতা ও গ্রন্থসাহেবে সেসব অকৃত্রিম ও অভিন্ন বাণীর সন্ধান পাওয়া যায়'। হুযূর (রাহে:) ভারত ও পাকিস্তান সরকারকে যুদ্ধাংদেহী মনোভাব পরিহার করে নিজনিজ কল্যাণে আত্মনিয়োগ করার পরামর্শ দেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে:) দীপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেন:'ভবিষ্যতে এ কাদিয়ানই হবে প্রকৃত জাতিসংঘের মূল কেন্দ্র' তিনি আরো বলেন:'ভবিষ্যতে কাদিয়ান জলসাই হবে আসল আর্ন্তজাতিক জলসা যেখানে লাখ লাখ মানুষ সমবেত হবে'।

কাদিয়ানের এ ঐতিহাসিক 'শতবার্ষিকী সালানা জলসায়' পৃথিবীর ৫০টি দেশ থেকে প্রায় ২৫ হাজার মানুষ উপস্থিত হয়েছিলেন। হুযূরের এ সফর পার্শ্ববর্তী দেশ পাকিস্তানের আহমদীদের জন্যও ছিল এক মহাআনন্দের বিষয়। ১৯৮৪ সালে প্রাণ প্রিয় নেতার হিযরতের ফলে খলীফায়ে ওয়াক্তের প্রত্যক্ষ তদারকী ও ভালবাসা থেকে দূরত্বের কারণে তাদের হৃদয়ে যে ব্যাথা দানা বেঁধে উঠেছিল তার কিছুটা হলেও নিরসনের সুযোগ হয়েছিল। তাই পাকিস্তান থেকে হাজার-হাজার নারী পুরুষ, শিশু যুবক কাদিয়ানের পথে বের হয়েছিলেন। তবে ভারত সরকারের ভিসা প্রদানে কঠোরতার কারণে মাত্র ৫ হাজার পাকিস্ত নী আহমদী এ জলসায় অংশগ্রহণের সুযোগ লাভ করেন আর অন্যরা ব্যাথিত হৃদয়ে নিজ গৃহে ফিরে যান। বহু কষ্টে যারা এসেছিলেন তাদের চোখে-মুখে ছিল অদ্ভূত এক তৃপ্তির ছাপ। বাংলাদেশ থেকেও সংক্ষিপ্ত সময়ের নোটিশে শতাধিক আহমদী এ জলসায় অংশগ্রহণের সুযোগলাভ করেন।

এ লেখার বিভিন্ন অংশে খলীফাতুল মসীহ্ আর রাবে (রাহে:)-এর বেশ কয়েকটি 'যুগান্তকারী তাহরিক' নিয়ে আলোচনা করেছি। এসবের বাইরেও হুযূরের আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ ও বরকতময় তাহরিক রয়েছে, যেমন ঃ

(০১) ১৯৮২ সালের ২৯ অক্টোবর হুযূর রাবে (রাহে:) দুস্থ ও এতিমদের জন্য বাড়ি ঘর নির্মাণার্থে 'বুয়ুতুল হামদ'-এর তাহরীক করেন। ১৯৮৭ সালের ৫ ডিসেম্বর তারিখে রাবওয়ায় 'দারুল ইয়াতামা' (এতিমদের ভবন)-এর ভিত্তি রাখা হয়।

(০২) ৫ নভেম্বর, ১৯৮২ সালে তাহরীকে জাদীদের নব বছরের ঘোষণার প্রাক্কালে 'দপ্তর আওয়ালের' মুজাহিদীনের (১৯৩৪-১৯৪৪) কুরবানীকে চির প্রবাহমান রাখার উদ্দেশ্যে তাদের ভবিষ্যত প্রজন্মকে পূর্বপুরুষদের নামে তাহরীকে জাদীদের চাঁদা অব্যাহত রাখার তাহরীক করেন এবং তাহরীকে জাদীদের তৃতীয় দপ্তর (১৯৬৬-১৯৮৪) লাজনাদের উপর ন্যস্ত করেন।

(০৩) ১২ জুলাই, ১৯৮৩ সালে খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে:) খুতবা জুমআয় ঈদের আনন্দে নিজ গরীব ভাইদের অংশীদার করার তাহরীক করেন।

(০৪) ৪ মার্চ, ১৯৮৬ সালে হুযূর (রাহে:) বিরুদ্ধবাদীদের নগ্ন আক্রমণে শাহাদাৎ বরণকারীদের পরিবারের ভরণ পোষণার্থে 'সৈয়্যদনা বেলাল ফান্ড'-এর প্রবর্তন করেন।

(০৫) ৩ এপ্রিল, ১৯৮৭ সালে খুতবা জুমআয় খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে:) আহমদীদের ভাবী সন্তানদেরকে ইসলাম ও আহমদীয়াতের সেবায় জীবন উৎসর্গ করার উদ্দেশ্যে যুগান্তকারী 'ওয়াকফে নও' তাহরিক করেন। বর্তমানে 'ওয়াকফে নও' মুজাহিদীনের সংখ্যা ২১ হাজারের উর্দ্ধে। নিকট ভবিষ্যতেই এসব মুজাহিদীন বিশ্বব্যাপী ইসলামের সেবায় আত্মনিয়োগ করে ইসলাম তথা আহমদীয়াতের বিজয়ে নেতৃত্ব দিবে, ইন্শাল্লাহ্।

(০৬) ৫ ডিসেম্বর, ১৯৮৭ সালে 'ওয়াকফে জাদীদ' কে সারা বিশ্বের জন্য Open করে দেন। এর ফলস্বরূপ বিশ্বব্যাপী ইসলামের শিক্ষা ঘরে-ঘরে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে।

(০৭) হুযূর (রাহে:) গরীব মেয়েদের বিয়ে-শাদীতে তাঁর মায়ের বিশেষ অনুগ্রহের কথা স্মরণ রেখে তাদের বিয়েতে সহায়তার জন্য ২১ ফেব্রুয়ারী, ২০০৩ সালে হুযূর (রাহে:) 'মরিয়ম শাদী ফান্ড' গঠনের তাহরীক করেন। আর এটিই হুযূরে জীবনের সর্বশেষ তাহরীক।

হুযূর যেভাবে এ নশ্বর পৃথিবী ছেড়ে চলেগেলেন ঃ

১৯৯২ সালের ২-৩ এপ্রিলের মধ্যরাতে হুযূর (রাহে:)-এর প্রিয় সহধর্মীনি আসেফা বেগম সাহেবার অকাল মৃত্যু হুযূরের জীবনের এক করুণ অধ্যায়। দাম্পত্য জীবনের এ অকৃত্রিম জীবন সঙ্গীনিকে হারিয়ে হুযূর একাকিত্বের মাঝে যে কতটা অসহায় হয়ে পরেছিলেন তা হুযূর (রাহে:)-এর কাজে-কর্মে প্রকাশ না পেলেও ভেতরে-ভেতরে এর এক করুণ পরিণতি এগিয়ে চলছিল। অবশ্য হুযূরের বেগম সাহেবার মৃত্যুর পরে হুযূরের বাহ্যিক চাল চলনে ব্যাপক পরিবর্তন প্রকাশ পেতে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০০২ সালের ৫ জুলাই খুতবা জুমুআ দেয়ার প্রাক্কালে হুযূর অসুস্থ হয়ে পরেন। হুযূর (রাহে:)-এর অসুস্থতার দৃশ্য সারা পৃথিবীর আহমদীরা এম.টি.এ-এর মাধ্যমে দেখতে পেয়ে ভীষণভাবে বিচলিত হয়ে পরেন। হুযূরের সুস্থতা কামনায় দেশে দেশে আহমদীরা সদকা ও বিশেষ দোয়ায় রত হয়ে যান। এ বছরের ২৬-২৮ জুলাই তারিখে ইউ.কে-এর ৩৬ তম সালনা জলসায় হুযূর অসুস্থ শরীর নিয়ে উপস্থিত হন। অসুস্থতা সত্ত্বেও হুযূর নিয়মিত জামাতের কার্যক্রম তদারকি করে যাচ্ছিলেন। বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শে এ বছরেরই ৩০ অক্টোবর তারিখে লন্ডনের এক হাসপাতালে হুযূরের রক্ত ধমণীর অপারেশন হয়। কয়েকদিন পরে ৭ নভেম্বর হুযূর হাসপাতাল থেকে বাসায় ফিরে আসেন। এ যাত্রায় হুযূর অলৌকিকভাবে মোটামুটি সুস্থ হয়ে ওঠেন। অর সবকাজই সুষ্ঠভাবে করতে থাকেন। কিন্তু হুযূরের হারানো স্বাস্থ্য আর ফিরে আসেনি বরং দিন দিন হুযূর দূর্বল হতে থাকেন।

এ চলমান দুর্বলতা সত্ত্বেও হুযূরের কাজ কর্ম থেমে ছিলনা। ২০০৩ সালের ১৮ এপ্রিল হুযূর (রাহে:) জীবনের শেষ জুমুআর খুতবা প্রদান করেন এবং মজলিসে ইরফানে (প্রশ্নোত্তর সভায়) যোগ দেন। সেদিন মজলিসে ইরফানে হুযূরকে এতোটা হাসিখুশি ও উৎফুল দেখাচ্ছিল যে সারা পৃথিবীর আহমদীরা মনে করলেন হুযূর বুঝি পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেছেন। কিন্তু পরের দিন ১৯ এপ্রিল লন্ডন সময় সকাল ৯.৩০ মিনিট নাগাদ এ ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ দীর্ঘ ২১ বছর ধরে খিলাফতের মহান দায়িত্ব পালনকালে প্রায় ৭৫ বছর বয়সে তাঁর প্রিয় ভক্তদের শোকের সাগরে ভাসিয়ে হঠাৎ হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে প্রিয় মওলার দরবারে চলে যান।

প্রায় ৩ ঘন্টা পরে এম.টি.এ-তে হুযূরের প্রাইভেট সেক্রেটারী মোকাররম মুনির আহমদ জাভেদ সাহেবের অশ্রুসিক্ত-ভারাক্রান্ত কণ্ঠে এ মর্মস্পর্শী ও হৃদয়বিদারক ঘোষণা বিশ্বের প্রায় ২০ কোটি আহমদী নর নারী সহ অগণিত ভক্তকূলের জীবনে বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত সবকিছু ওলট পালট করে দেয়। টেলিভিশনে এম.টি.এ-এর সামনে বসে তাদের সে আহাজারী আর কান্না আরশের ভিত্তিকে যেন কাঁপিয়ে তোলে। আহমদীরা তাদের দৈনন্দিন নিয়মিত কাজ-কর্ম পরিত্যাগ করে দিশেহারা হয়ে পরেন। সারা পৃথিবীর হাজার-হাজার আহমদী হুযূরের মোবারক চেহারা শেষবারের মত দর্শন আর তাঁর নামাযে জানাযায় শরিক হওয়ার জন্য লন্ডনে একত্রিত হতে থাকে একই সাথে অ-আহমদী সাধারণ মানুষসহ বিভিন্ন শ্রেণীর নেতৃবৃন্দ জাতিভেদ ভুলে হুযূরের প্রতি শেষবারের মত সম্মান দেখাতে লন্ডনে আসেন। ১৮ এপ্রিল মাঝ রাত থেকেই লন্ডনের ১৬ গ্রিসেন হল রোডস্থ মসজিদ ফযলের আঙ্গিনায় হুযূরের মরদেহ সর্বসাধারণের দর্শনের জন্য উন্মুক্ত স্থানে রাখা হয়। মসজিদ ফযলের আশ পাশের রাস্তা-ঘাট লোকে লোকারন্য হয়ে ওঠে। হাজার হাজার মানুষের ঢল শামলাতে বৃটিশ সরকার ও প্রশাসনকে হিমশিম খেতে হয়। কর্তৃপক্ষ রাস্তায় গাড়ি চলাচল বন্ধ রাখতে বাধ্য হয়ে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। এম.টি.এ-এর মাধ্যমে সারা পৃথিবীর মানুষ সে দুর্লভ দৃশ্য দেখার সুযোগ লাভ করে।

এ কঠিন মুহূর্তে নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া জামাতের অস্থায়ী কেন্দ্র লন্ডন থেকে এম.টি.এ-এর মাধ্যমে বার বার ঘোষণার মাধ্যমে জামাতকে ধৈর্য আর দৃঢ়তা প্রদর্শনের আহ্বান জানানো হয়। একই সাথে কাদের খোদা, হযরত রসূলুলাহ্ (স:) এবং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ:)-এর অমর ভবিষ্যদ্বাণী স্মরণ করিয়ে জামাতকে অভয় বাণী শোনানো হয় আর সেই মহা ঐশী বাণীর আলোকে 'কুদরতে সানীয়ার' পুনঃ বিকাশ অবলোকেনের জন্য খাস দোয়ারও আহ্বান করা হয়। এ অমোঘ ঘোষণার পরে ধীরে ধীরে সমগ্র পৃথিবীর আহমদীরা এ কঠিন শোকের মাঝেও দৃঢ়তার পরিচয় প্রদান করে 'কুদরতে সানীয়ার' পূর্ণ প্রকাশের জন্য বিগলিত চিত্তে দোয়ায় রত হয়ে যান।

এদিকে পূর্ব ঘোষণানুযায়ী 'মজলিসে ইন্তেখাবে খিলাফতের' সম্মানিত সদস্যরা পরবর্তী খিলাফতের নির্বাচন ও হুযূর (রাহে:)-এর জানাযায় অংশ গ্রহণের জন্য লন্ডনে একত্রিত হতে শুরু করেন। ২২ এপ্রিল মাঝরাতে 'মজলিসে ইন্তেখাবে খিলাফতের' সভায় খলীফাতুল মসীহ্ খামেস হিসেবে হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ সাহেব (আই:) খলীফা নির্বাচিত হওয়ার পরে ২৩ এপ্রিল দুপুর আড়াইটায় টিলফোর্ডের ইসলামাবাদে হুযূর (রাহে:)-এর নামাযে জানাযার ঘোষণা দেয়া হয়। ইতোমধ্যেই হুযূরের মৃত্যু সংবাদে ছুটে আসা হাজার হাজার মানুষের থাকা-খাওয়ার জন্য ইসলামাবাদে যাবতীয় ব্যবস্থা সম্পন্ন করা হয়েছিল। এ ব্যবস্থাপনা রীতিমত ইউ.কে. সালানা জলসার ব্যবস্থাপনার মতই ছিল। ২৩ এপ্রিল সকাল ১১টা নাগাদ হুযূরের মরদেহ লন্ডন থেকে বিশেষ গাড়ি বহর সহকারে টিলফোর্ডের ইসলামাবাদের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়। হুযূরের মরদেহবাহী বিশেষ গাড়ীসহ অন্যান্য গাড়ীর বহর বৃটিশ পুলিশের গাড়ি সামনে পেছনে এসকর্ট করে এগিয়ে নিয়ে যায়। হুযূরের মরদেহ যে পথ দিয়ে যাচ্ছিল ট্রাফিক পুলিশ সে পথে অন্যান্য যানবাহন চলাচল সাময়িক বন্ধ করে দেয়। আকাশেও বৃটিশ পুলিশের হেলিকাপ্টার নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলার বিষয়টি নিশ্চিত করে। একজন নির্বাসিত ধর্মীয় নেতার প্রতি শেষ শ্রদ্ধা নিবেদনে বৃটিশ সরকার যে ভূমিকা রেখেছে তা ইতিহাসে বিরল।

টিলফোর্ড ইসলামাবাদে মরদেহ পৌঁছার পরে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ খামেস (আই:)-এর ইমামতিতে হুযূর (রাহে:)-এর নামাযে জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। সারা পৃথিবী থেকে আগত প্রায় ২০ হাজার প্রতিনিধি এ জানাযায় অংশগ্রহণ করেন। জানাযা শেষে হুযূর (রাহে:)-এর কফিন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ খামেস (আই:)-এর নেতৃত্বে কবরস্থানে নিয়ে যাওয়া হয়। প্রয়াত খলীফার কফিন বর্তমান খলীফা কাঁধে করে বহন করে তাঁর প্রতি মহান দায়িত্ব পালন আর তাঁর থেকে দায়িত্ব গ্রহণের নিদর্শন স্থাপন করেন। পূর্ব থেকেই টিলফোর্ড ইসলামাবাদে হুযূর (রাহে:)-এর প্রিয় সহধর্মীনি মরহুমা আসেফা বেগম সাহেবার কবরের পার্শ্বেই হুযূরের জন্য কবর বানিয়ে রাখা হয়েছিল। খলীফাতুল মসীহ্ খামেস (আই:)-এর নেতৃত্বে হুযূর (রাহে:)-এর দেহ মোবারক কবরে সমাহিত করা হয়। এ সময় হাজার হাজার মানুষ কান্নায় ভেঙে পরেন। সবশেষে খলীফাতুল মসীহ্ খামেস (আই:) হুযূর (রাহে:)-এর কবরের পার্শ্বে দোয়া করিয়ে বিদায় নেন।

সংকলন- **মৌলবী এম.এম. তৌহিদুল ইসলাম**

খান বাহাদুর আবুল হাশেম খান চৌধুরী

(পঞ্চম কিস্তি)

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) ২৯ নভেম্বর ১৯৩৫ তারিখে জুমুআর খুতবায় বলেন, 'আমি এরূপ ব্যক্তি চাই যারা নিজে পাগল এবং অপরকে পাগল করে তুলে'। প্রকৃতপক্ষে আবুল হাশেম সাহেব খেলাফতের ডাকে সেরূপ পাগলই হয়ে গিয়েছিলেন। সেকালে বঙ্গদেশে যে সকল জ্ঞান তাপস মনীষী ছিলেন তাদেরকে তিনি আহমদীয়াতের সত্যতার ওপর অনেক তবলীগ করেছেন। বাঙ্গালী বিভিন্নজনকে তবলীগে পাগল করার প্রচেষ্টা করেন। ফলে এ তবলীগ-পাগলের কর্মতৎপরতাকে অনেকে ভয় করতেন। এ প্রসঙ্গে ইউরোপ ও আমেরিকা বিজয়ী সাহাবী হযরত ডক্টর মুফতি মোহাম্মদ সাদেক (রাঃ) বলেন, আমি প্রচারক হিসেবে যখন লন্ডনে ছিলাম তখন একজন বাঙ্গালী মুসলমান উচ্চ শিক্ষার্থে সরকারী বৃত্তি নিয়ে লন্ডনে আসেন। তাঁর সাথে পরিচয়ের পর তিনি একদিন আমাকে বললেন–আপনাদের সদস্যরা সর্বদা তবলীগে ব্যস্ত থাকেন। বাংলা দেশে আপনাদের ক'জন প্রচারক আছেন। তন্মধ্যে আবুল হাশেম খান চৌধুরী অন্যতম। আমরা তাঁকে দেখলে রীতিমত ভয় করে চলি। (দৈনিক আল ফযল ১৯ জুলাই ১৯৪৭)। এ ভয় ছিল অজ্ঞতার ভয়। সত্যকে উপলব্ধি করার জ্ঞানের অভাবের কারণে সৃষ্ট। কিন্তু আবুল হাশেম সাহেবের মাঝে ছিল জাহেলীয়াতের মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষার পথের দিশার প্রচেষ্টা।

এদেশের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ প্রিন্সিপাল ইব্রাহীম খাঁর সাথে চৌধুরী সাহেবের ছিল অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব। সে সুবাদে প্রিন্সিপাল সাহেবকে আহমদীয়তের সত্যতার ওপর অনেক তবলীগ করেছেন, যা তাঁর হৃদয়পটে দানা বাঁধে। তাই প্রিন্সিপাল সাহেব তাঁর আত্মজীবন স্মৃতিতে মুক্ত কণ্ঠে উলেখ করেনঃ

নাটোরের খান বাহাদুর আবুল হাশেম খান চৌধুরী ঢাকার স্কুল ইন্সপেক্টর। তাঁকে আমার এক খন্ড কামাল পাশা পাঠিয়ে দিলাম।

লিখে পাঠালেন–ঢাকায় এলে আমার সঙ্গে নিশ্চয় দেখা করবেন, জরুরী আলাপ আছে। ভাবলাম হয়তো করটিয়ার ইস্কুল কলেজ মাদ্রাসার কোনটি সম্বন্ধে আলাপ করবেন। দেখা করলাম। বললেন, 'কামাল পাশা পড়ে আমি বুঝতে পেরেছি, ইসলামের জন্য আপনার আগ্রহ কত তীব্র।'

'সামান্য খাদেমের মত আমি কিছু করতে চাই এই মাত্র।'

আবুল হাশেম খান চৌধুরী

'এ-আপনার বিনয়। আর আসলেও তো আমরা সামান্যই করতে পারি, খাঁ সাহেব। তবে সেই খেদমতের জন্য প্রশস্ত রাস্তা চাই।'

'বলুন'

'এই জামানায় সেই রাস্তা বাতলিয়েছেন কাদিয়ানের মির্যা গোলাম আহমদ সাহেব।'

'তাঁর নাম শুনেছি।'

'তিনি অদ্ভুত লোক ছিলেন। তাঁর প্রভাবে যারা ইসলামের সেবা ব্রতে নেমেছিলেন, আজ তাঁরাই দুনিয়ার দিকে দিকে তবলীগ করে বেড়াচ্ছেন। মালয়ে তাঁরা, মাদাগাস্কারে তাঁরা, আফ্রিকার জঙ্গলে তাঁরা, আবার ইউরোপ আমেরিকার মত সুসভ্য দেশেও তাঁরাই ইসলামের পতাকা তুলে ধরেছেন।'

'হ্যাঁ, তাঁরা যে নিতান্ত মূল্যবান কাজ করছেন তা শুনেছি।'

'তবে আপনিও এই পথে আসুন। পুঁথি-পত্রে ইসলামের কথা বলার মূল্য আছে, কিন্তু তার চেয়ে অনেক বেশি ফায়দা ইসলামকে জীবনে রূপায়িত করে তাই নিয়ে মানুষের সামনে উপস্থিত হওয়া।'

'জীবনে ইসলামকে রূপায়িত করার মহিমাকে আমি আন্তরিক ভাবে বিশ্বাস করি।'

'তবে আসুন আমাদের পথে।'

নিতান্ত ভাল মানুষ ছিলেন এই চৌধুরী সাহেব; ধর্মোৎসাহ ছিল তাঁর অফুরন্ত, অন্তরের নির্মলতা দীপ্তি লাভ করেছিল তাঁর সুন্দর চেহারায় ; পরম আদরে পরম আগ্রহে , তিনি আমায় ডেকেছিলেন। যেতে পারি নাই। কিন্তু তাঁর সে আহ্বানের কথা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করি। (বাতায়ন, পৃষ্ঠা ৩১০-৩১১)

প্রিন্সিপাল ইব্রাহীম খাঁ-এর মত এমন অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তির ঐশী নূরে নূরান্বীত হওয়ার সৌভাগ্য লাভ না হলেও আবুল হাশেম সাহেবের অকাট্য যুক্তির বিনয় ব্যবহারে আহমদীয়াতের সত্যতা উপলব্ধি করেছিলেন।

খেলাফতের সাথে চৌধুরী সাহেবের ছিল নিবিড় সম্পর্ক। হুযূর সানী (রাঃ)-কে তিনি অত্যন্ত ভক্তি শ্রদ্ধা করতেন, আত্মার আত্মীয় মনে করতেন। হুযূর সানী (রাঃ)-ও তাঁকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন এবং তাঁর অনেক দোয়া পেয়েছেন। তাই একদা তিনি যুগ ইমাম আমীরুল মুমেনীনের প্রতি তাঁর হৃদয়ের উচ্ছাস প্রকাশ করতে গিয়ে হুযূরের খেদমতে একটি ভক্তি উপহার পেশ করেছিলেন। তা মাসিক আহমদী, আগষ্ট, ১৯৩৭ থেকে নিম্নে পত্রস্থ করা হল–

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম
নাহমাদুহু নুসাল্লি আলা রাসূলুহিল কারীম

আমীরুল-মুমিনীন হযরত খলীফাতুল-মসীহ্ মীরজা বশীরউদ্দিন মাহমুদ আহমদ সাহেবের (আইঃ) খেদমতে
ভক্তি উপহার

বঙ্গদেশবাসী আহমদীগণের পক্ষ হতে

'খেলাফত সংখ্যা আহমদী'

হে খোদাতাআলার মনোনীত খলীফা! আজ বহু দিন পরে ইসলামের ভাগ্যাকাশে পূর্ণচন্দ্র উদিত হয়েছে। তাই আজ আমাদের হৃদয় আশা ও আনন্দে উৎফুল। আপনি সেই পূর্ণচন্দ্র হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর স্থলাভিষিক্ত। আজ আপনার নেতৃত্বে আমাদের ধর্ম-বিশ্বাস সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে, আমাদের হৃদয়ের সকল ভীতি দূরীভূত হয়ে শান্তি বিরাজ করছে। শত্রু ও মোনাফেকগণ যা-ই বলুক আপনার নেতৃত্বে আমরা আপন আপন হৃদয়ে বিশ্বাস ও বল পুনঃ সঞ্চারিত দেখে ধন্য হয়েছি। ইসলামের বিজয় অভিযানে আপনি যে পথে অগ্রসর হয়েছেন খোদা করলে জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত আমরা আপনার সঙ্গে থাকব। এই প্রতিজ্ঞার নিদর্শণস্বরূপ আজ বঙ্গদেশবাসী আহমদীদের মধ্যে ১২২৫ জনের সমবেত ভক্তি উপহার আপনার পাক খেদমতে উপস্থিত করছি। আপনি স্নেহ ও করুণা পরবশ হয়ে এই নগণ্য উপহার গ্রহণ করুন ও আমাদেরকে কৃতার্থ করুন এবং খোদাতাআলার নিকট দোয়া করুন যেন খোদাতাআলার পাক 'ওহী' অনুযায়ী তিনি এই দুর্বল জামাতকে 'ঈমান' ও 'নেক আমলের' উচ্চতম আসনে স্থান দান করেন। খোদাতাআলার 'রহমতের' ছায়া সর্বদা আপনার ওপর বিরাজমান থাকুক–আমীন।

আবুল হাশেম খান চৌধুরী
আমীর, বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জুমানে আহমদীয়া, ঢাকা।

১৯৩৯ সাল আহমদীয়াতের ইতিহাসের গৌরবের ও সুবর্ণ বছর। ইসলামের পুনরুত্থানে জামাতে আহমদীয়ার পঞ্চাশ বছর পূর্তি, হযরত খলীফাতুল

মসীহ্ সানী (রাঃ)-এর গৌরবময় খেলাফতের ২৫ বছরের পূর্ণতা এবং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর প্রতিশ্রুত মহান পুত্র হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রাঃ) কীর্তিমান জীবনের ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণতার অর্ধশতাব্দী অতিক্রমের সাল। যাদের জীবনে এ ঐশী নেয়ামতের সময় পরিপক্ষ হয় তাঁরা সৌভাগ্যবান। তাই আলাহ্তাআলার প্রতি শুকরানা স্বরূপ ১৯৩৯ সালে খেলাফত জুবিলী উৎসব পালনের জন্য কাদিয়ান থেকে ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। এ বর্ণালী উৎসব পালনে মূল উদ্যোক্তাদের মধ্যে স্যার মোহাম্মদ জাফরুলাহ্ খান চৌধুরী ছিলেন। তিন লক্ষ টাকা ব্যয়ে গৃহীত এ বিরাট কর্মসূচী ১৯৩৭ সালে বিশ্বব্যাপী ঘোষণা করা হয়। অর্থ সংগ্রহে জামাতে আহমদীয়ার প্রত্যেক উপার্জনশীল ব্যক্তিদের নিকট থেকে তাঁর এক মাসের উপার্জিত আয়ের সমপরিমাণ অর্থ চাঁদা প্রদানের তাহরীক ছিল। জুবিলী ফান্ডের এ চাঁদা ছিল জামাতে আহমদীয়ার প্রথম স্বেচ্ছায় প্রদত্ত ঐচ্ছিক চাঁদা।

খেলাফত পাগল বঙ্গীয় আমীর সাহেব এ তাহরীক শুনেই ১৯৩৮ সালের ৪ ও ৫ অক্টোবর বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জুমানে আহমদীয়ার উদ্যোগে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় অনুষ্ঠিত মজলিসে শূরায় বিষয়টির উপর গুরুত্বে সাথে আলোচনা করেন এবং বঙ্গদেশ থেকে জুবিলী ফান্ডে অধিক পরিমাণে চাঁদা প্রদান ও উপস্থিতির সিদ্ধান্ত নেন। তাই শূরার পর পর ৬, ৭, ও ৮ই অক্টোবর অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক জলসায় তিনি এর প্রতি উদ্ধাত্ত আহ্বান জানান। ফলে বাঙ্গালী ধর্মপ্রাণ আহমদীরা নেক কাজের প্রতিযোগিতায় জলসার অনুষ্ঠানেই ১,৪০০ টাকা চাঁদা পরিশোধের প্রতিশ্রুতি দেন। পরবর্তীতে বঙ্গীয় আমীর সাহেব খেলাফতের গুরুত্ব এবং খেলাফত জুবিলী ফান্ডে চাঁদা প্রদানে আলাহ্তাআলার শুকরিয়া জ্ঞাপনের প্রয়োজনীয়তা ব্যাপকভাবে প্রচারের ফলে চাঁদার পরিমাণ ক্রমাগত বৃদ্ধি পায়। এতদ্ব্যতীত তিনি স্যার মোহাম্মদ জাফরুলাহ্ খান চৌধুরী সাহেবের প্রস্তাব অনুযায়ী নিজে ১০০০ টাকা চাঁদা পরিশোধ করে প্রথম সারীর চাঁদা দাতা অর্থাৎ FOUNDERS LIST -এ নাম অন্তর্ভুক্তির সৌভাগ্যবান হন। তার পরিবারের সদস্যরা উপার্জনশীল না হলেও তাঁর আদর্শগত শিক্ষায় সহধর্মিণী সৈয়দা হোসনে আক্তার বানু ত্রিশ টাকা, মেয়ে আমেনা খাতুন, তায়েবা খাতুন ও আবেদা খাতুন বার টাকা করে চাঁদা প্রদানে এ মহতী প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করেন। আর এক চাঁদা দানবীর মৌলভী মোবারক আলী সাহেব ১০০০ টাকা চাঁদা দানে FOUNDERS LIST-এ নাম অন্তর্ভুক্তি লাভ করেন। ত্রিশ দশকের এই ১০০০ টাকা বর্তমানের লক্ষ টাকারও অধিক। ফলে দুই বীর বাঙ্গালীর এত বড় আর্থিক কুরবানী বাংলার মুখকে উজ্জ্বল করে তুলে। তখন বঙ্গদেশ থেকে প্রায় ১৫০ জন ধর্মপ্রাণ ভ্রাতা প্রায় ৪০০০ টাকা চাঁদা প্রদান করেছিলেন।

সে সময় বিভিন্ন জামাতেও খেলাফত জুবিলী উৎসব পালনের তাহরীক করা হয়। বঙ্গীয় আমীর সাহেব বঙ্গদেশের বিভিন্ন জেলা জামাতের উদ্যোগে জসনে জৌলসে খেলাফত জুবিলী উৎসব পালনের কর্মসূচী প্রদান করেছিলেন। ফলে ১৯৩৯ সালে নির্ধারিত বিভিন্ন তারিখে ত্রিপুরা, ময়মনসিংহ, রংপুর, মুর্শিদাবাদ, বাকুড়া, ঢাকা, কলকাতা ও বগুড়া প্রভৃতি জেলা জামাতের উদ্যোগে জাঁকজমকভাবে জলসার অনুষ্ঠান পালিত হয়। কর্মসূচীতে বিশেষতঃ ছিল হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) নিকট অভিনন্দন পত্র প্রেরণ। সভার এক-দুই দিন পূর্ব থেকে মিছিল করে হামদ্, দুরূদ এবং ইসলামের বিজয়ের বাণী প্রচার। সভার ৮/১০ দিন পূর্ব থেকে যুবকরা বিভিন্ন দলে পরিভ্রমণ করে নব সঞ্জীবিত ইসলামের বাণী মানুষের দ্বারে দ্বারে পৌছানো। বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের সমন্বয়ে বিভিন্ন ধর্মের প্রবক্তাদের জীবনী ও শিক্ষার ওপর আলোচনা করা এবং বিভিন্ন বিষয়ে প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা ইত্যাদি। ফলে বঙ্গদেশের বাঙ্গালী আহমদীরা আনন্দঘন পরিবেশে হৃদয়ের উচ্ছাসে উৎফুলভাবে এ উৎসব পালন করেন।

অতঃপর কেন্দ্রীয়ভাবে কাদিয়ানের খেলাফত জুবিলী জলসার উৎসব ঘনিয়ে আসলে কাদিয়ান প্রেমিক বঙ্গীয় আমীর সাহেব অধিক সংখ্যক বঙ্গবাসীকে কাদিয়ানে উপস্থিতির জন্য উদ্বুদ্ধ করেন। ফলে বাংলাদেশ থেকে ৮০ জনের একটি বিরাট কাফেলা প্রাণের টানে দুর্গমগিরি পার হয়ে পবিত্রভূমি কাদিয়ানে যান। প্রতি বছর সাধারণত ২৬, ২৭, ও ২৮ কিংবা ২৭, ২৮, ও ২৯ ডিসেম্বর কাদিয়ানে বিশ্ব আহমদীয়ার কেন্দ্রীয় জলসা অনুষ্ঠিত হলেও ১৯৩৯ সনের জলসা খেলাফত জুবিলী জলসা হিসেবে ২৬ থেকে ২৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত চারদিন ব্যাপী মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হয়। দেশ বিদেশের পঞ্চাশ হাজারের বেশী ধর্মপ্রাণ ব্যক্তির উপস্থিতিতে জলসা আলোড়ন সৃষ্টি করে। সকলের প্রফুলতায় কাদিয়ানের আকাশ বাতাস মুখরীত হয়ে উঠে। আহমদীয়াতের বিশ্ববিজয়ের ঐশী নিদর্শন পরিস্ফুটিত হয়।

২৬ ডিসেম্বর সকালে ঐশী নেতা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) কর্তৃক জলসার উদ্বোধনীর পর ঐ দিন দ্বিতীয় অধিবেশনে সভাপতিত্ব করার সৌভাগ্য লাভ করেন আমাদের বঙ্গীয় আমীর আবুল হাশেম সাহেব। হুযূর সানী (রাঃ) কর্তৃক তাঁকে সভাপতিত্ব করার জন্য মনোনীত করা বাঙ্গালীদের জন্য গৌরবের বিষয়, বিরাট প্রাপ্য। ২৮ ডিসেম্বর প্রত্যেক জামাত বিভিন্ন পূণ্য বাক্য খচিত স্ব স্ব পতাকা সহ তসবীহ, তাহমীদ, তকবীর ও গান গেয়ে মিছিল করে জলসাগাহে উপস্থিতির কর্মসূচীতে বীর বাঙ্গালীর একটি মিছিল আবেগপ্লুত হয়ে উপস্থিত হন। এতে আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ)কে অভিনন্দন প্রদান অধিবেশনে বঙ্গীয় জামাতের পক্ষ থেকে বাঙ্গালীর গৌরবের আমীর আবুল হাশেম সাহেব অভিনন্দন পত্র পাঠ করেন। এ অভিনন্দন পত্রটি ১৯৩৯ সালে ২৭,২৮, ও ২৯ অক্টোবর তারিখে অনুষ্ঠিত ২৩তম প্রাদেশিক জলসায় সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়েছিল। হুযূর সানী (রাঃ) পাঠকৃত বিভিন্ন অভিনন্দন পত্রের উত্তর প্রদান করেন। জামাতে আহমদীয়ার পতাকা উত্তোলন করা হয় এবং স্যার মোহাম্মদ জাফরুলাহ্ খান চৌধুরী জুবিলী উপলক্ষ্যে জামাতের পক্ষ থেকে হুযূর সানী (রাঃ) খেদমতে তোহফা পেশ করেন জামাতের বিশিষ্ট আলেম বিভিন্ন বিষয়ের ওপর সারগর্ভ বক্তব্য রাখেন। ফলে জুবিলী জলসা সফল হয়, ইতিহাস সৃষ্টি করে। আর এই ইতিহাস সৃষ্টির প্রতিযোগিতায় আবুল হাশেম সাহেবের নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত।

চৌধুরী সাহেবের কর্মতৎপরতায় এ দেশে আহমদীয়াত অনেক বিস্তার লাভ করে। ১৯২৬ সালে বঙ্গীয় প্রথম আমীর মাওলানা সৈয়দ আব্দুল ওয়াহেদ সাহেবের ওফাতের সময় বঙ্গদেশে জামাতের সংখ্যা যেখানে ২৬টি ছিল তা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়ে ৪র্থ আমীর চৌধুরী সাহেবের এমারত কালে ১৯৩৮ সালে ৪০টিতে পৌঁছে। বঙ্গদেশের ২৭টি জেলার মধ্যে ২৩টি জেলায় আহমদীয়াত বিস্তার লাভ করে। (পাক্ষিক আহমদী ৩০ নভেম্বর ১৯৩৮)। ১৯৩৯ সালে জামাতের সংখ্যা ৪৩টি হয় (পাক্ষিক আহমদী ১৫ ডিসেম্বর ১৯৩৯)। তখন বড় বড় জামাতে নব নব মসজিদ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। উপরন্তু বঙ্গদেশে সর্বপ্রথম ব্রাহ্মণবাড়ীয়ায় স্থাপিত মসজিদুল মাহদীর অনেক উন্নয়ন ও সংস্কারের কাজ করেছেন চৌধুরী সাহেব। তিনি এ কাজের প্রাক্কালে বিষয়টি হুযূর সানী (রাঃ)-এর খেদমতে পেশ করলে হুযূর পঞ্চাশ টাকার অনুদান প্রদান করেন এবং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর সহধর্মিনী হযরত উম্মুল মুমেনীন (রাঃ) পঞ্চাশ টাকা দান করেন। বঙ্গদেশের আহমদীদের নিকট চাঁদার তাহরীক করা হলে ২৬ আগষ্ট ১৯৩৮ তারিখ শুক্রবার ব্রাহ্মণবাড়ীয়া মহকুমাস্থ আঞ্জুমান সমূহের প্রেসিডেন্ট ও সেক্রেটারীরা সমবেত হয়ে নিজ নিজ জামাতের পক্ষ থেকে মোট ৩৩৪.৫০ টাকা পরিশোধ করেন। পরবর্তীতে আরও চাঁদা প্রাপ্তির প্রেক্ষিতে মসজিদুল মাহদীর উন্নয়ন ও সংস্কারের কাজ যথার্থভাবে সম্পন্ন হয়। *(চলবে)*

মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল

আহমদীয়ত

মূল ঃ **কাযী মোহাম্মদ নাযির সাহেব ফাযেল**
নাযের তসনীফ ও ইশাআত লিটারেচার, রাবওয়া

(সপ্তম কিস্তি)

"এই যা কিছু সেই মহান বুযুর্গ লিখেছেন যে, [মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর অবতরণ সংক্রান্ত] দামেস্ক সম্বলিত হাদীসের ভিত্তিকে আলাদা ছেড়ে দিয়ে আলাদা মসীলে মসীহ্‌র দাবী প্রকাশ করা হলে এতে দোষ কি? আসলে এ অধমের মসীলে মসীহ্ হওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। এটাই হতে চাই যেন খোদাতাআলা নিজ বিনীত বান্দা ও অনুগত বান্দাদের শামেল করে নেন। কিন্তু আমরা পরীক্ষা থেকে কোনভাবেই পালাতে পারি না। খোদাতাআলা কেবল পরীক্ষাকেই উন্নতির মাধ্যম বানিয়েছেন। যেভাবে তিনি বলেছেন–**আহাসিবান্নাসু আঁইউতরাকূ আঁ ইয়া কূলূ আমান্না ওয়া হুম লা ইউফতানূন** অর্থাৎ তারা কি মনে করে নিয়েছে যে, তারা ঈমান এনেছে বললে তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হবে অথচ তাদেরকে পরীক্ষা করা হবে না? (মকতুবাত, ৫ম খন্ড, নং ২ পৃষ্ঠা ৮৫ এর বরাতে)।

এ উদ্ধৃতি উপস্থাপন করে নদভী সাহেব লিখেনঃ

"এ পরামর্শের প্রকৃত কারণ ও কার্যকারিতা কী ছিল? এটা কি হাকীম সাহেবের দুরবীনি দূরদর্শিতা ও দুঃসাহসী স্বভাবেরই ফলশ্রুতি ছিল অথবা এটা সমসাময়িক সরকারের ইঙ্গিত ছিল যাকে অদূর ভবিষ্যতে হযরত সাইয়্যেদ সাহেবের ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব ও তাঁর তাহরীক ও আহ্বানে খুবই ক্ষতি সাধিত হয়েছিল আর সেই যুগাবর্তেই সুদানী মাহদীর মাহদীয়্যতের দাবীতে সুদানে একটি শক্তিশালী উত্থান ও বিদ্রোহ সৃষ্টি হয়েছিল? এসবকে ভঙ্গ করে আর ভবিষ্যতের বিপদাবলীর রহস্য উন্মোচনের লক্ষ্যে এটাই সমীচীন পন্থা ছিল যে, কোন বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তিত্ব যিনি মুসলমানদের মাঝে নিজ ধর্মীয় সেবা ও ধর্মীয় উদ্দীপনা দিয়ে প্রভাব সৃষ্টি করে নিয়েছেন। মসীহে মাওউদ-এর দাবী ও ঘোষণার সাথে দাঁড়ায় আর সেই মুসলমান যারা এক সময় পর্যন্ত মসীহে মাওউদ-এর প্রতীক্ষায় ছিল তার চার দিকে সমবেত হয়ে যায়। আমরা আস্থার সাথে এথেকে কোন একটি জিনিষের সমর্থন করতে পারি না। আর কারণ ও কার্যকারিতার অন্বেষণ করা সহজ। কিন্তু এ আন্দোলনের সূচনা কিভাবে হয়ে থাকে এ পত্র থেকে এতটা তো অবশ্যই সাব্যস্ত হয়" (কাদিয়ানিয়্যত ; পৃষ্ঠা ৬৭-৬৮)।

এখানে এ কথাটিও স্মরণে রাখার যোগ্য, নবী ও রসূলগণের আবির্ভাবের বিষয়টি পরস্পর পরামর্শ করে ঠিক করা হয় না। এঁদের ওপর আকাশ থেকে ওহী অবতীর্ণ হয় আর তাঁদেরকে তাদের পদ ও মর্যাদার অকাট্য ও পূর্ণ সংবাদ দেয়া হয়ে থাকে। আর তাঁরা দৃঢ়-বিশ্বাসের সাথে বিভোর হয়ে থাকেন এবং প্রথম দিন থেকেই এর ঘোষণা ও এতে মনোযোগ নিবদ্ধ করে থাকেন। তাদের ধর্ম-বিশ্বাস ও আহ্বানের ধারা কোন প্রস্তাবনা বা (পার্থিব) পথপ্রদর্শনের মুখাপেক্ষী হয় না। প্রথম দিন থেকেই তাঁরা বলেন–**ওয়া বি যালিকা উমিরতু ওয়া আনা আওওয়ালুল মুসলিমীন** –আমাকে এর আদেশ দেয়া হয়েছে আর আমি এর প্রতি প্রথম বিশ্বাস স্থাপনকারী।

পত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে তো মৌলভী আবুল হাসান নদভী সাহেব মসীহ্ মাওউদ-এর দাবীর আসল প্রস্তাবক, প্রণেতা ও ঘোষণার কল্পিত উৎস হযরত হাকীম মাওলানা নূরুদ্দীন সাহেব (রাঃ)-কে নির্ধারণ করেছেন। কিন্তু উদ্ধৃতির পরে তিনি স্বয়ং এ বিষয়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকেন নি আর এটা লিখছেন, এটা হাকীম সাহেবের দূরবিনী দূরদর্শিতা বা দুঃসাহসী স্বভাবের ফলশ্রুতিতে ছিল বা সমসাময়িক সরকারের ইঙ্গিতে ছিল আর শেষে এটা লেখেন, নবী ও রসূলগণের বিষয়টি এসব বাহ্যিক ঘোষণা ও পরামর্শগুলো থেকে আলাদা নয়। তাঁদের কাছে আকাশ থেকে ওহী অবতীর্ণ হয়, তাদেরকে এ পদ ও মর্যাদার অকাট্য ও সুস্পষ্ট সংবাদ দেয়া হয়।

আমরা এ প্রবন্ধের প্রারম্ভে আহমদী জামাতের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতার সেই ওহী লিখে দিয়েছিলাম যা মসীহ্ মাওউদের দাবীর প্রসঙ্গে তাঁর (আঃ) প্রতি আকাশ থেকে অবতীর্ণ হয়েছিল। এতে তাকে তাঁর পদ ও মর্যাদা সম্বন্ধে সুস্পষ্টভাবে সংবাদ দিয়ে দেয়া হয়েছিল ঃ আপনি মসীহ ইবনে মরিয়মের ভবিষ্যদ্বাণীর উদ্দিষ্ট ব্যক্তি আর মসীহ্ ইবনে মরিয়ম মারা গেছে এবং আপনি তাঁর রঙ্গে রঙ্গীন হয়ে খোদার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী এসেছেন। এর আগে যখন আপনার প্রতি মসীলে মসীহ্ হওয়ার কাশ্‌ফ (দিব্য-দৃষ্টি) হয়েছিল তখন আপনার প্রতি অবতীর্ণ ইলহাম ফাস্‌দা' বিমা তু'মার অনুযায়ী তিনি প্রথম প্রথমই স্পষ্টভাবে এর ঘোষণা করে দেন। যেভাবে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের ওপর যখন নবুওয়ত প্রসঙ্গে কাশ্‌ফ এবং ওহীর মাধ্যমে হয়েছিল তখন তিনি (সঃ) নিজেকে নবী ও রসূল হিসেবে উপস্থাপন করেন এবং যখন দীর্ঘ দিন পর তাঁর (সঃ) প্রতি ওহীর মাধ্যমে তাঁর খাতামান্নাবীঈন হওয়ার কাশ্‌ফ হয় তখন তিনি এরও ঘোষণা দিয়ে দেন। অতএব খোদার প্রত্যাদিষ্ট পুরুষগণ খোদার বলাতে বলেন, খোদা না বল্লে বলেন না আর নিজেদের পক্ষ থেকে কোন দাবীও করেন না।

হযরত মৌলভী নূরুদ্দীন সাহেব (রাঃ)-এর পরামর্শ বা সরকারের ইঙ্গিতে আহমদী জামাতের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা দাবী করেছেন–এ ধারণা সর্বৈব মিথ্যা। হুযূর (আঃ)-এর যে পত্রের উদ্ধৃতি নদভী সাহেব উদ্ধৃত করেছেন এথেকে প্রকাশিত হয়, মৌলভী নূরুদ্দীন সাহেব (রাঃ) তাঁকে (আঃ) স্বয়ং একটি পরামর্শ দিয়েছিলেন আর এ পরামর্শ ছিল না যে, আপনি মসীহ্ মাওউদ-এর দাবী করুন বা মসীলে মসীহ্-এর দাবী করুন। মসীলে মসীহ্-এর দাবী তো তিনি (আঃ) বারাহীনে আহমদীয়ার যুগেই করেছিলেন। আর হযরত মৌলভী নূরুদ্দীন সাহেব (রাঃ) তাঁর দাবী সম্বন্ধে সংবাদও পান নি। তিনি তো তাকে পরিষ্কার এ পরামর্শ দিয়েছেন, আপনি নিজে আপনাকে দামেস্কী হাদীসের উদ্দিষ্ট ব্যক্তি নির্ধারণ করবেন না। এতে লোকেরা পরীক্ষায় পড়বে। কিন্তু হযরত মসীহে মাওউদ (আঃ) তার এ পরামর্শ অগ্রাহ্য করেন এবং বলিষ্ঠ ভাষায় এটা বলেন ও লিখেন, আমরা পরীক্ষা থেকে পালাতে পারি না। আশ্চর্য কথা এই, হযরত মির্যা সাহেব হাকীম সাহেবের প্রস্তাবনা গ্রহণ করতে অপারগ ছিলেন। নদভী সাহেব নিজেও এ বিষয় সম্বন্ধে অবগত। অতএব তিনি লিখেন ঃ

"মির্যা সাহেব যে রঙ্গে হাকীম সাহেবের প্রস্তাবনা গ্রহণ করতে অপারগতা প্রকাশ করেন আর তার পত্র থেকে যে শিষ্টতা, ভীতি ও বিনয় প্রকাশিত হয় তা উল্লেখযোগ্য। আর এতে মির্যা সাহেবের মর্যাদা বৃদ্ধি পায়" (কাদিয়ানিয়্যত, পৃষ্ঠা ৭০)।

এ উদ্ধৃতি পর্যন্ত মৌলভী নদভী সাহেব যখন প্রাচ্যবিদদের ন্যায় আহমদী জামাতের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতার হযরত মৌলভী নূরুদ্দীন সাহেব (রাঃ)-এর পরামর্শ গ্রহণ করতে অপারগতার

উল্লেখ করে প্রশংসা করেছেন। এখন পরে দেখুন তিনি এ মিষ্টিতে বিষ মিলিয়ে এটা লিখেন ঃ

"কিন্তু তার পুস্তকগুলোর ঐতিহাসিক হিসাব নেবার পর এ প্রভাব ও মাহাত্ম্য সত্বর শেষ হয়ে যায়। হঠাৎ এটা জানা যায়, মির্যা সাহেব হাকীম সাহেবের এ প্রস্তাব গ্রহণ করে নেন। আর অল্প দিনেই তিনি মসীলে মসীহ্ হওয়ার দাবী ঘোষণা করে দেন" (কাদিয়ানীয়্যত, পৃষ্ঠা ৭০)।

এটা সুস্পষ্ট যে, মৌলভী নদভী সাহেব কর্তৃক স্বীকৃত সেই চিঠি-পত্র যা তিনি উদ্ধৃত করেছেন এতে ১৮৯১ সনের ২৪শে জানুয়ারী লেখা আছে (কাদিয়ানীয়্যত, পৃষ্ঠা ৬৭)।

এ পত্র দ্বারা তিনি এ ফলাফল বের করেছেন, মির্যা সাহেব মৌলভী নূরুদ্দীন সাহেবের প্রস্তাবনা গ্রহণ করতে অপারগতা প্রকাশ করেছেন। স্মরণ রাখা উচিত যে, প্রস্তাবটি ছিল এই, দামেস্কী হাদীসের উদ্দিষ্ট ব্যক্তি নিজেকে নিজে নির্ধারণ করবেন না। নিজেকে নিজে মসীলে মসীহ্ নির্ধারণ করুন বা মসীহ্ মাওউদ দাবী করুন–এ প্রস্তাব ছিল না। কেননা, এ দাবী তো তাঁর (আঃ) মজুদ ছিলই। প্রস্তাব গ্রহণ করতে অপারগতা প্রকাশ করা সত্ত্বেও এখন প্রস্তাব গ্রহণ করে নেয়ার দলিল মৌলভী নদভী সাহেব এটা দিচ্ছেন যে, ১৮৯১-এর প্রকাশিত পুস্তক 'ফতেহ্ ইসলাম'-এ "আমরা প্রথম বার তাঁর এ দাবী সম্বন্ধে পাঠ করি যে, তিনি মসীলে মসীহ ও মসীহে মাওউদ।"

কিন্তু আসল তাৎপর্য এই, হযরত মৌলভী নূরুদ্দীন সাহেব (রাঃ) হযরত মসীহে মাওউদ-এর দাবীর সংবাদ পাওয়ার পর লিখেছেন আর এর সংবাদ পাওয়ার পরই হযরত মৌলভী সাহেব (রাঃ) আজ স্বয়ং পরামর্শ দেন যে, দামেস্কী হাদীসের উদ্দিষ্ট ব্যক্তি হওয়ার দাবীকে আলাদা রেখে মসীলে মসীহ্র দাবী করা হোক। হযরত মৌলভী নূরুদ্দীন সাহেব (রাঃ)-এর এটা লেখার প্রয়োজন কি এজন্যেই করছিল যে, এখন এ মসীলে মসীহ্কেই আহমদী জামাতের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা নিজ ইলহামের ভিত্তিতে মসীহে মাওউদ নির্ধারণ করে দিচ্ছিলেন নচেৎ সেই মসীলে মসীহ্র দাবী তো এর অনেক আগেই তিনি (আঃ) উপস্থাপন করে রেখেছিলেন।

অতএব হযরত মৌলভী সাহেব (রাঃ)-এর এ পরামর্শ ছিল না যে, আপনি মসীহে মাওউদ -এর দাবী করুন বরং এ পরামর্শ ছিল, আপনি নিজেকে নিজে দামেস্কী হাদীসের উদ্দিষ্ট ব্যক্তি সাব্যস্ত করবেন না। এ পরামর্শ হুযূর (আঃ) গ্রহণ করেন নি বরং নদভী সাহেবের ভাষ্য অনুযায়ী হুযূর এটা মানতে অপারগতা প্রকাশ করেন। এজন্যে নদভী সাহেবের এটা লেখা ভুল ঃ

"হঠাৎ জানা গেল, মির্যা সাহেব মৌলভী নুরুদ্দীন সাহেবের প্রস্তাব গ্রহণ করে নিলেন"।

নদভী সাহেবের স্ববিরোধপূর্ণ বর্ণনাঃ

আর আজব কথা এই, এখন নদভী সাহেব এ প্রস্তাবনা বানিয়ে নিয়েছেন যে, মৌলভী নূরুদ্দীন সাহেব (রাঃ) হযরত মির্যা সাহেব (আঃ)-এর কাছে মসীহ্ মাওউদ-এর দাবী করার প্রস্তাব উপস্থাপন করেছিলেন। আবার হযরত মির্যা সাহেবের "ফত্হে ইসলাম" পুস্তকে মসীহে মাওউদ-এর দাবী দেখে এটা বলে দিলেন দেখ, মির্যা সাহেব মৌলভী নূরুদ্দীন সাহেবের প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন। মৌলভী নদভী সাহেবের এ স্ববিরোধপূর্ণ বর্ণনা সর্বৈব সত্য গোপন করার উজ্জ্বল দলীল-প্রমাণ বহন করে। নদভী সাহেবের ভাষ্যানুযায়ী যদি "ফত্হে ইসলাম" পুস্তক প্রকাশের সময় হযরত মির্যা সাহেব (আঃ) হযরত মৌলভী নূরুদ্দীন সাহেবের পরামর্শ বা প্রস্তাব গ্রহণ করে থাকতেন তাহলে এটাই তো হওয়া উচিত ছিল যে, তিনি নিজেকে নিজে ১৮৯১ সনে দামেস্কী হাদীসের উদ্দিষ্ট ব্যক্তি নির্ধারণ করতেন না। কেননা, এ প্রস্তাবই তো হযরত মৌলভী নূরুদ্দীন সাহেব (রাঃ) উপস্থাপন করেছিলেন অর্থাৎ আপনি নিজেকে নিজে মসীলে মসীহ বা মসীহে মাওউদ-এর দাবীর প্রকাশ দামেস্কী হাদীসকে পৃথক রেখে করুন। কিন্তু এর বিপরীত আমরা দেখি, ১৮৯১ সনের প্রকশিত পুস্তক 'ইযালায়ে আওহাম'-এ তিনি নিজেকে নিজে দামেস্কী হাদীসের উদ্দিষ্ট ব্যক্তি নির্ধারণ করেন। এ হাদীসের উদ্দিষ্ট ব্যক্তি নির্ধারণ করার পর 'ইযালায়ে আওহাম'-এর ৬৩-৭০ পৃষ্ঠার পাদটীকা মুখর সাক্ষী। এ থেকে নিম্নোক্ত উদ্ধৃতি দ্রষ্টব্য ঃ

"সহী মুসলিমে যে একথা লেখা আছে, হযরত মসীহ্ দামেস্কের শ্বেত মিনারার পূর্ব দিকে অবতরণ করবেন.....'দামেস্ক' শব্দের ব্যাখ্যায় আমার কাছে প্রকাশ করা হয়েছে যে, এখানে এমন বসতির নাম দামেস্ক রাখা হয়েছে যাতে এমন লোক থাকে যারা ইয়াজিদ স্বভাবাপন্ন আর ইয়াজিদের ন্যায় নোংরা অভ্যাস ও ধ্যান-ধরণার অনুসারী।"

পরে ৭২ পৃষ্ঠার পাদটীকায় লেখেন ঃ

"কাদিয়ানের প্রসঙ্গে আমার কাছে ইলহাম হয়েছে **আখরাজা মিনহুল ইয়াযীদিয়্যুনা**–অর্থাৎ এতে ইয়াজিদ স্বভাবাপন্ন লোকদের সৃষ্টি করা হয়েছে।"

এর পর আরও একটি ইলহাম ঃ **ইন্না আনযালনাহু ক্বরীবা মিনাল ক্বাদিয়ান** উল্লেখ করে লিখেন ঃ

"এখন একটি নতুন ইলহাম থেকে এ বিষয় প্রমাণের চূড়ান্ত পর্যন্ত পৌঁছে গেছে যে, কাদিয়ান খোদাতাআলার দৃষ্টিতে দামেস্কের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।"

আবার এ ইলহামের ব্যাখ্যায় পরে লেখেন ঃ

"এর ব্যাখ্যা এই ঃ **ইন্না আনযালনাহু ক্বরীবা মিনা দিমাশ্ক বাতারফে শারক্বী 'ইনদাল মিনারাতুল বায়যায়ে"** অর্থাৎ নিঃসন্দেহে আমরা একে দামেস্কের কাছে পূর্ব দিকে শ্বেত মিনারের কাছে অবতীর্ণ করেছি। কেননা, এ অধমের বসবাসস্থল কাদিয়ানের পূর্ব কিনারে অবস্থিত" (ইযালাহ্ আওহাম, পাদটীকা পৃষ্ঠা ৭৩-৭৫)।

ইযালাহ আওহামের এ উদ্ধৃতি থেকে এটা সুস্পষ্ট, হযরত মসীহে মাওউদ আলায়হেস সালাম হযরত মৌলভী নূরুদ্দীন (রাঃ)-এর এ পরামর্শ এবং প্রস্তাব একেবারেই গ্রহণ করা হয় নি যেন দামেস্কী হাদীস নিজের প্রতি আরোপ না করা হয়। বরং এ পরামর্শকে নাকচ করে সুস্পষ্টভাবে এ হাদীসকে নিজের প্রতি আরোপ করেছেন। আর কাদিয়ানকে নিজের ইলহামগুলোর আলোকে রূপকভাবে দামেস্কী বলে ব্যাখ্যা করেছেন। হযরত মৌলভী নূরুদ্দীন সাহেব (রাঃ)-এর পরামর্শ কেবল এটা ছিল, মসীলে মসীহের দাবীকে দামেস্কী হাদীস থেকে পৃথক রাখা আবশ্যক। কেননা, লোকদের পরীক্ষায় পড়ার আশঙ্কা ছিল। কিন্তু হুযূর (আঃ) এসব পরামর্শকে নাকচ করতে গিয়ে পরীক্ষা প্রসঙ্গে মু'মিনসুলভ জবাব দিয়েছেন ঃ

"আমরা পরীক্ষা থেকে কোন রকম পালাতে পারি না। খোদাতাআলা উন্নতির মাধ্যম কেবল পরীক্ষার মাঝেই নিহিত রেখেছেন যেভাবে তিনি বলেছেন–**আহাসিবান্নাসু আঁইউতরাকূ আঁইয়াক্বূলূ আমান্না ওয়া হুম লা ইউফ তানূন**" (মকতুবাতে আহমদীয়া, ৫ম খন্ড, নম্বর ২, পৃষ্ঠা ২৮৫)। *(চলবে)*

অনুবাদ – **মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান**

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আইঃ)-এর মরিশাস (Muritius) সফরের সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন

হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আইঃ) গত ২৯/১১/০৫ইং মরিশাসের ৪৪তম সালানা জলসায় যোগদানের জন্য লন্ডন হতে রওয়ানা দেন। হুযূর (আইঃ) মরিশাস সফরের দ্বিতীয় দিনে মরিশাসের প্রেসিডেন্টের সাথে সাক্ষাত করেন। প্রায় ২০ মিনিট দীর্ঘ এই সাক্ষাতে হুযূর পাকিস্তানে আহমদীদের ওপর নির্যাতনের কথাও বলেন। সবশেষে হুযূর (আইঃ) মরিশাসের প্রেসিডেন্টকে তোহ্ফা প্রদান করেন। এরপর গত ২ ডিসেম্বর মরিশাসের প্রতিরক্ষা সচিব হুযূরের সাথে দেখা করার সৌভাগ্য লাভ করেন। তিনি হুযূর (আইঃ)-কে স্বাগত জানান এবং মঙ্গল কামনা করেন। তিনি বলেন যে এটি মরিশাসের সৌভাগ্য যে আমহদীয়া জামাতের ঈমাম মরিশাসে এসেছেন। দেশটির অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতির জন্য হুযূর (আইঃ)-এর কাছে দোয়ার আবেদন জানান। হুযূর (আইঃ) সে দেশের তথ্য প্রযুক্তির উন্নতির প্রতি প্রতিরক্ষা সচিবের দৃষ্টি আকৃষ্ট করেন। এছাড়া সারা দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির ওপর আলোকপাত করেন। বৈঠক শেষে প্রতিরক্ষা সচিব ছবি তোলার জন্য হুযূর (আইঃ)-এর সাথে দাঁড়ান। ১ ডিসেম্বর হুযূর (আইঃ) মরিশাসের জলসার প্রস্তুতি ঘুরে দেখেন এবং কর্মীদের উদ্দেশ্য করে বিভিন্ন দিক-নির্দেশনা প্রদান করেন। ২ ডিসেম্বর মরিশাসের ৪৪তম সালানা জলসার উদ্দেশ্যে জলসাগায়ে যান এবং আহমদীয়া জামাতের পতাকা উত্তোলন করেন। এর পর তিনি জুমুআর খুতবা প্রদান করেন যার মাধ্যমে জলসার উদ্বোধন হয়। হুযূর (আইঃ) জুমুআর খুতবায় বলেন, আজ আল্লাহ্তাআলার ফযলে জামাতে আহমদীয়া মরিশাস-এর ৪৪তম সালানা জলসা শুরু হচ্ছে। হুযূর (আইঃ) বলেন আমার মনে হয় কোন খলীফার উপস্থিতিতে এটাই মরিশাসের প্রথম জলসা। আল্লাহ্তাআলা সর্বদিক থেকে এ জলসাকে সফলতা দান করুন। হুযূর (আইঃ) বলেন, সর্বদা স্মরণ রাখবেন জামাতে আহমদীয়ার জলসার এক বিশেষ উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। আর সবচেয়ে বড় উদ্দেশ্য হল আল্লাহ্তাআলার তাকওয়া অর্জন করা। হুযূর (আইঃ) খুতবায় বিশেষভাবে সত্যবাদীতা এবং কুরআনের আদেশের প্রতি আমল করার দিকে দৃষ্টি প্রদান করেন।

৩ ডিসেম্বর হুযূর (আইঃ) মহিলাদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন। হুযূর (আইঃ) তার বক্তব্যে সমাজের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য রক্ষায় নারীদের ভূমিকা সম্পর্কে আলোকপাত করেন। বক্তৃতার এক পর্যায়ে হুযূর (আইঃ) মহিলাদের উদ্দেশ্য করে বলেন, আহমদী মা এবং আহমদী সন্তানদের নিজেদের ইবাদতের দিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি দেওয়া উচিত। যেন সব ধরনের নোংড়ামি এবং অশ্লীলতা থেকে তারা নিজেরা এবং তাদের সন্তানরা নিরাপদ থাকতে পারে। হুযূর (আইঃ) আরও বলেন, অনেক মেয়ে কাজের বাহানায়, কাজের অজুহাতে, কাজের সময় এমন পোষাক পড়ে যা ইসলামী পোষাক নয়। হুযূর (আইঃ) বলেন, এই ধরনের কাজ করাই উচিত নয়। হুযূর (আইঃ) বক্তৃতার শেষদিকে বলেন, আজকের মেয়ে কালকের মা হবে। যদি সমস্ত মেয়েদের ভিতর দায়িত্ব বোধের চেতনা সৃষ্টি হয় তাহলে আহমদীয়াতের ভবিষ্যত প্রজন্ম নিরাপদ। হুযূর (আইঃ) বলেন, নামাযকে আপনাদের হেফাজত করতে হবে যেন খোদাতাআলার ফযলকে আপনারা নিজেদের ঘরে আনতে পারেন। তারপর হুযূর (আইঃ) সালাম জানিয়ে মহিলাদের কাছ থেকে বিদায় নেন। ৪ ডিসেম্বর মরিশাসের জলসা সালানার শেষ দিন। হুযূর (আইঃ) জলসাগায়ে এসে সমাপনি অধিবেশনের আগে বয়াত পরিচালনা করেন। তারপর সমাপনি অধিবেশনে মরিশাসের আহমদী ছাত্রদের বিভিন্ন পড়াশুনায় উত্তম ফলাফলকারীদের পুরস্কার প্রদান করেন। এর পর হুযূর (আইঃ) সমাপনী বক্তব্য রাখেন যাতে তিনি ইবাদতের মানদন্ডে পৌঁছার প্রতি আলোকপাত করেন। সবশেষে দোয়ার মাধ্যমে জলসার কার্যক্রম শেষ হয়। গত শুক্রবার ৯/১২/২০০৫ইং হুযূর (আইঃ) মরিশাসের দারুস সালাম মসজিদে জুমুআর খুতবা প্রদান করেন। উক্ত খুতবায় হুযূর (আইঃ) মরিশাসে আহমদীয়া জামাতের ইতিহাস সম্পর্কে ঈমান উদ্দীপক বর্ণনা দেন। হুযূর (আইঃ) বলেন, মহান খোদার রহমতে মরিশাসে আমার প্রথম সফর শেষ হয়ে আসছে এবং আমি ছোট্ট দ্বীপের দেশটির মানুষদেরকে অনুগত ও বিশ্বাসী হিসেবে পেয়েছি। হুযূর (আইঃ) স্থানীয় জামাতটির জন্য দোয়া করেন এবং দ্বীপের প্রথম আহমদীদের মত অকৃত্রিম আদর্শ বজায় রাখতে উৎসাহিত করেন। হুযূর (আইঃ) বলেন, ১৯১২ সালে মরিশাসে প্রথম জামাত প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সে সময় ব্যাপক বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয় তারপরেও অগ্রগামী আহমদীরা দৃঢ় ছিলেন এবং খোদার দিকে ঝুকেঁছিলেন। বার বার তারা অনুরোধ করার পর ১৯১৫ সালে সুফি গোলাম মোহাম্মদ সাহেবকে মরিশাসের ১ম মিশনারী হিসেবে প্রেরণ করা হয়। তার কর্মতৎপরতায় জামাত বৃদ্ধি পেতে থাকে। মরিশাসের দ্বিতীয় মিশনারী ছিলেন হযরত হাফেয উবায়দুল্লাহ্ সাহেব। তিনি জামাতের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। ১৯২৮ সালে হাফেয জামান আহমদ সাহেবকে মরিশাসে প্রেরণ করা হয়। তাঁর মৃত্যুর পর খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) বলেন ঐ জমি হচ্ছে সৌভাগ্যবান যেখানে তাঁর মত একজন বিশ্বাসী এবং ধার্মিকের কবর রয়েছে। হুযূর (আইঃ) বলেন, মরিশাসের উক্ত কয়েকজন আহমদীদের কথা উল্লেখ করার কারণ হল স্থানীয় জামাতের জন্য তারা যে পরিশ্রম করেছেন তা তুলে ধরা যাতে তাদের কুরবানী সমূহ স্মরণ ও অনুসরণ করা হয়। হুযূর (আইঃ) খুতবার এক পর্যায়ে যাকাত ও যাদের হজ্জ করা ফরজ তারা যেন হজ্জ করেন এই ব্যাপারেও আলোকপাত করেন। হুযূর (আইঃ) সূরা আনফালের ৪৭ নং আয়াত পাঠ করে তার উপর আলোকপাত করেন যাতে পারস্পারিক ঐক্যের কথা বলা হয়েছে। খুতবার শেষ দিকে হুযূর (আইঃ) মরিশাসের জামাতের জন্য দোয়া করেন। তারা যেন অকৃত্রিমভাবে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)এর বাণীকে অনুধাবন করতে পারেন। আমীন। তারপর হুযূর (আইঃ) ১১/১২/০৫ ইং মরিশাস থেকে কাদিয়ানের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেন। এই ছিল হুযূর (আইঃ)-এর মরিশাস সফরের সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন।

M.T.A হতে সংকলন

মাহমুদ আহমদ সুমন

মরহুম আলহাজ্জ আহমদ তৌফিক চৌধুরী স্মরণে

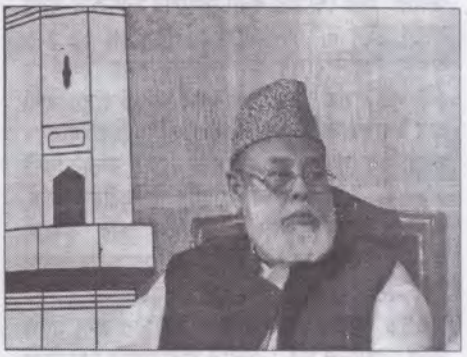

তখন আমি ময়মনসিংহের কিশোরগঞ্জে পূবালী ব্যাংকে কর্মরত ছিলাম। ১৯৮০ সালের ৬ই এপ্রিল তৎকালীন কিশোরগঞ্জ মহকুমা শিক্ষা অফিসার খন্দকার আজমল হক সাহেবের তবলীগে পবিত্র আহমদীয়া মুসলিম জামাতে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করি। সেখানে শহরে আজমল হক সাহেবের পরিবারটি ছিল শুধু আহমদী। তার বাসায় ৪/৫ জন মিলে জুমুআর নামায পড়তাম। কথা প্রসঙ্গে তিনি একদিন বললেন ময়মনসিংহ শহরে আহমদ তৌফিক চৌধুরী সাহেব নামে একজন প্রভাবশালী আহমদী রয়েছেন। নতুন আহমদী হিসাবে তখন আহমদী ভ্রাতাদের সাথে পরিচিত হওয়ার জন্য ব্যাকুল ছিলাম। গাইবান্ধা বাড়ী থেকে ময়মনসিংহের কিশোরগঞ্জ যাওয়ার সময় মনস্থ করলাম চৌধুরী সাহেবের সঙ্গে দেখা করব। ট্রেনে ময়মনসিংহ স্টেশনে নেমে মহারাজা রোড সামান্য একটু পথ। বাসার সামনে নিরিবিলি পরিবেশ। কলিংবেল টিপতেই বাড়ির ভৃত্য এসে লাইব্রেরী ঘরের দরজা খুলে বসতে বললেন। ঘরের চারদিকে তাকিয়ে দেখি আলমারি ভর্তি শুধু বই আর বই। একটু পরেই ঘর আলোকিত করে ঢুকলেন-আহমদ তৌফিক চৌধুরী। একেবারে শ্বেত শুভ্র দীর্ঘ কায়া অপরূপ শশ্রুমন্ডিত শান্ত চেহারা-মনে হলো বনি ইসরাইলের কোন পুরুষ ইতিহাসের বুক চিরে আমার সামনে আবির্ভূত হয়েছেন। প্রথম দর্শনেই যেন হৃদয়ের সমস্ত শ্রদ্ধা ও ভালবাসা উজার করে দিতে ইচ্ছা করলো। সালাম ও কুশলাদি বিনিময়ের পরে আপ্যায়ীত করলেন দৈহিক ও আধ্যাত্মিক উভয় খাবারে। বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচার থেকে শুরু করে বাইবেলের শিক্ষা বনাম খ্রিষ্টানদের ধর্ম বিশ্বাস প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে অনেকগুলো বই উপহার দিলেন। সাপ্তাহিক আলমিনার ও দ্বিমাসিক ঋতু পত্রের অনেকগুলো কপি দিলেন। ঋতু পত্রের নিয়মিত গ্রাহক বানিয়ে নিলেন। সারারাত ট্রেন, স্টিমার ও ঘাটের বিড়ম্বনায় শরীর ও মন উভয়েই বিষিয়ে উঠেছিল। মাজরাজা রোডের এই বাড়িতে এসে তার দ্বিগুণ পরিমাণ শান্তি ও তৃপ্তিতে হৃদয় পূর্ণ হয়ে উঠল। অনাবিল আনন্দ নিয়ে কর্মক্ষেত্র কিশোরগঞ্জে ফিরে এলাম। মনে মনে অনুভব হলো আহমদীরা বিশাল মন ও জ্ঞানের অধিকারী। ইতিমধ্যে পাক্ষিক আহমদীর গ্রাহক হয়েছিলাম। ১৫ দিন পর পাক্ষিক আহমদী আর ২ মাস ঋতু পত্রের অধীর আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করতাম। ০৯-০৬-১৯৮৪ইং তারিখে মহান আল্লাহ্ এক অভাবনীয় সুযোগ সৃষ্টি করে দিলেন। আমাকে পূবালী ব্যাংক যাদব লাইড়ী লেন শাখায় বদলি করা হল। হর্ষোৎফুল্ল চিত্তে আমি ময়মনসিংহে চলে এলাম। ব্যাংকের কাজ কর্ম সেরে মহারাজা রোড চৌধুরী সাহেবের বাসায় বাজামাত মাগরিব ও এশার নামায আদায় নিয়মিত রুটিনে পরিণত হল। আমাদের সাথে মাঝে মধ্যে যোগ দিতেন লাইব্রেরীয়ান সহকারী নূরুল হোসেন, আব্দুল বাতেন, শফিউল হক খান (মিলকী)। মাগরিবের পরে শুরু হত ধর্মীয় জ্ঞানের আলোচনা, চলতো এশা বা এশারও অনেক পর পর্যন্ত। মরহুম চৌধুরী সাহেব এখানে একক বক্তা আমরা সবই ক্ষুধার্ত শ্রোতা। আলোচনা করতেন আহদীয়াত তথা প্রকৃত ইসলামের বিভিন্ন দিক, ইহুদী ও খৃষ্টান ধর্ম, হিন্দু ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম, বাহাই ধর্ম, ব্রম্ম সমাজ প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে। মন্ত্র মুগ্ধের ন্যায় দিনের পর দিন এগুলো শুনতাম আর গোগ্রাসে গিলতাম। জ্ঞান, বিজ্ঞান, ধর্ম, দর্শন, ইতিহাস ও সাহিত্যের এসব নিত্য নতুন তত্ত্ব ও তথ্য এত সুন্দর ও আকর্ষণীয়ভাবে পরিবেশন করতেন যে মনে হত সারারাত এই অমৃত সুধা পান করি। পাশাপাশি ভিতর থেকে খালাম্মা পাঠাতেন সুস্বাদু চা-বিস্কুট। দিনের মধ্যে যত মেহমানই আসুক আর যত বারই আসুক খালাম্মা ততবারই তাদেরকে চা-বিস্কুট পরিবেশন করতেন। কোন দিনই এর ব্যতিক্রম হয় নি। এর মধ্যে আল্লাহ্তাআলা আরেকটি সুযোগ সৃষ্টি করে দিলেন- যাতে করে মরহুম চৌধুরী সাহেবের নিবিড় সান্নিধ্যে আরও বেশি করে উপকৃত হতে পারি। অক্টোবর ১৯৮৫ সালে শাখা ব্যবস্থাপকের অনিয়মের কারণে ব্যবস্থাপক সহ আমাদের সবাইকে সাসপেন্ড করা হয়। এ সময় অফিসে হাজিরা দেওয়ার কোন প্রয়োজনীয়তা ছিল না। এতে পুরো সময় জামাতের কাজে ব্যয় করার সুযোগ পাওয়া গেল। (১৪-০৯-১৯৮৬ইং তারিখে আমাকে আল্লাহ্তাআলা আবার সম্মানের সাথে ব্যাংকের কাজে যোগাদানের তৌফীক দান করেন। ব্যাংক সমস্ত অভিযোগ প্রত্যাহার পূর্বক পদোন্নতি করে)। এখানে উল্লেখ্য যে মরহুম চৌধুরী সাহেব তখন ময়মনসিংহ জামাতের প্রেসিডেন্ট এবং আমি তার অধীনে জামাতের সেক্রেটারী মাল ও খোদ্দামুল আহমদীয়া ময়মনসিংহ টাঙ্গাইল ও জামালপুরের জেলা কায়েদ। দিন রাত যে কোন সময় তাকে সঙ্গ দেওয়ার আর কোন বাধা থাকলো না। ময়মনসিংহ শহরের সব ধরনের সাহিত্যিক, সামাজিক, ধর্মীয় সভা-সমাবেশ ও সেমিনার মরহুম চৌধুরী সাহেব একজন গুরুত্বপূর্ণ বক্তা হিসাবে নিয়মিতভাবে আমন্ত্রিত হতেন। হিন্দু সমাজ ব্রম্ম সামাজের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গিয়ে তিনি বেদ গীতা মহাভারত ও উপনিষদের একজন বিশেষজ্ঞ হিসাবে আলকুরআনের শিক্ষাকে তুলনামূলক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মাধ্যমে এত সুনিপুনভাবে তুলে ধরতেন যে শ্রোতারা সবাই মন্ত্র মুগ্ধের ন্যায় শুনত। সরকার পরিচালিত ধর্মীয় সংস্থা ইসলামিক ফাউন্ডেশন। মসজিদের ইমাম সাহেবদেরকে উন্নতর ধর্মীয় জ্ঞান বিজ্ঞান ও সামাজিক রীতি-নীতি শিক্ষা দেওয়ার জন্য এই সংস্থা মাঝে মধ্যে ইমাম প্রশিক্ষণ শিবির পরিচালনা করে থাকে। কাদিয়ানী জানা সত্ত্বেও মরহুম চৌধুরী সাহেবকে এই সংস্থার কর্মকর্তারা ইমাম প্রশিক্ষণ শিবিরের অন্যতম বক্তা/প্রশিক্ষক হিসেবে দাওয়াত করত- যেখানে আমি উপস্থিত ছিলাম। বাংলা ভাষার ওপর গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় এক সেমিনার ১৯৮৬ সালের কোন এক তারিখে ময়মনসিংহে অনুষ্ঠিত হয়। দেশের বরণ্যে সাহিত্যিক ভাষাবিদদেরকে সেখানে আমন্ত্রণ জানানো হয়। মরহুম চৌধুরী সাহেবকেও "বাংলা ভাষায় আরবী ও ফারসির মিশ্রণ" বিষয়ে বক্তব্য প্রদানের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়। অনেক উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে ময়মনসিংহ জামাতের অনেকেই আমরা উপস্থিত হলাম। শুরু হলো চৌধুরী সাহেবের ঐতিহাসিক বক্তৃতা। ভাষা ও সাহিত্যের এমন রসকস বিহীন একটা বিষয়কে তিনি এত সুন্দর ও আকর্ষণীয় ভাবে উপস্থাপন করলেন যে মনে হলো এই বক্তৃতা যদি সারা দিন ধরে চলতো তাহলে কতই না মজা হতো। শত সহস্র সহস্র এমন শব্দ যেগুলোকে আমরা খাঁটি ও অকৃত্রিম বাংলা হিসেবে চিনি বা জানি তিনি সেগুলো যে খাঁটি আরবি ফারসির মূল ধাতু থেকে রূপান্তর হয়ে বাংলাকে কিভাবে সমৃদ্ধ ও উন্নত করেছে তা অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে তুলে ধরলেন। মনে হচ্ছিল তিনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পাশাপাশি আরবি ও ফারসি ভাসা ও সাহিত্যেরও একজন বিদগ্ধ পন্ডিত ব্যক্তিত্ব যার নখ দর্পনে ছিল এসব ভাষার চুল চেরা নাড়ী নক্ষত্র। মরহুম চৌধুরী সাহেব ময়মনসিংহ শহরের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত এবং বাংলাদেশ কৃষিবিশ্ববিদ্যালয় এলাকা সর্বত্রই তিনি ছিলেন ব্যাপকভাবে সমাদৃত। কিন্তু প্রতিবেশী ২টি ধর্মীয় সংগঠন খ্রিষ্টান ও বাহাই মিশন মরহুম চৌধুরী সাহেবের নিকট যুক্তি দলিলে নাজেহাল হওয়ার কারণে তাকে বাঘের মত ভয় করত। এ ব্যাপারে ২টি ছোট ঘটনা সংক্ষেপে উল্লেখ করছি। ময়মনসিংহ স্টেশনের পাশেই খৃষ্টানদের রিডিং রুম ও গস্পেল হল অবস্থিত। সময়ের ফাকে ফাকে সেখানে গিয়ে একজন অনুসন্ধিৎসু হিসাবে কর্তাব্যক্তিটির সাথে পরিচিত হই। বই পুস্তক আদান প্রদান ও যাতায়াতের মাধ্যমে কর্তাব্যক্তিটির সাথে ঘনিষ্ঠতা বেড়ে উঠে। একদিন তাকে বললাম আপনাদের এখানকার সুন্দর পরিবেশ আমার খুব ভাল লাগে। তবে বাইবেলের বিষয়ে কিছু গড়মিলের মধ্যে অন্তত একটির সমাধন পেলেই আমি আপনাদের ধর্ম গ্রহণ করতে পারি। প্রশ্নটি হল ঃ ২ শ্যামূয়েল ৬ ঃ ২৩

অধ্যায় "আর শৌলের কন্যা মিখলের মরণকাল পর্যন্ত সন্তান হইল না" অন্যদিকে ২ শ্যামুয়েল ২১ ঃ ৮ অধ্যায় "আদ্রিয়েলের জন্য শৌলের কন্যা মিখল যে ৫টি পুত্র প্রসব করিয়াছিল"–বাইবেল ঈশ্বরের বাণী আর ঈশ্বরের বাণীর মধ্যে এরূপ স্ববিরোধিতা থাকতে পারে কিনা বুঝিয়ে বলুন। সঙ্গে সঙ্গেই কর্তাব্যক্তিটি অগ্নিশর্মা হয়ে বললেন আহমদ চৌধুরীর লোক, আপনি কাদিয়ানী.আপনি এখানে আর কখনো আসতে পারবেন না। মরহুম চৌধুরী সাহেবের বাসার পূর্ব দিকে নদীর কোল ঘেষে বাহাইদের মিশন অবস্থিত। কাজের অবসরে অনুসন্ধানের জন্য মাঝে মাঝে সেখানেও যাই। এভাবে যাতায়াতের মধ্য দিয়ে মিশন প্রধানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা সৃষ্টি হয়। অনেক বই পুস্তক নিয়ে পড়লাম। কুরআন হাদীসের দলিল দিয়ে বাহাই মতবাদকে উপস্থাপন করা হয়েছে-গয়ের আহমদী কোন মৌলভীর পক্ষেই তাদের যুক্তি খন্ডন সম্ভব নয়। ইরানী এ মিশন প্রধান একদিন একটি কার্ড (বয়াত ফরম) দিয়ে বললেন ভাই পূরণ করুন। আমি বললাম ঠিক আছে-দুটি ছোট্ট সমস্যার সমাধান পেলেই কার্ড পূরণ করবো। প্রথমত কুরআনের চেয়ে শ্রেষ্ঠত্বের দাবীদার বাহাই শরীয়ত গ্রন্থ 'আকদাস' দেখতে চাই, দ্বিতীয়ত বাহাউল্লাহ্ কর্তৃক অবতারিত গ্রন্থ কিতাবে ইক্কানের এক স্থানে বলা হয়েছ হযরত ঈসা (আঃ) মারা গেছেন, অন্য স্থানে বলা হয়েছে তিনি চতুর্থ আকাশে উত্থিত হয়েছেন। কোনটি সঠিক? বলা মাত্রই মিশন প্রধান তেলে বেগুনে জ্বলে উঠে বললেন "আপনি আহমদ তৌফিক চৌধুরীর নিকট থেকে এসেছেন আপনি কাদিয়ানী, আপনি এখান থেকে চলে যান আর কখনও এখানে আসবেন না।" কটিয়াদির সাবেক প্রেসিডেন্ট মরহুম এজাজুল হক কবিরাজ সাহেব কটিয়াদি বাজারে তবলিগী সভায় বক্তৃতা করার জন্য মরহুম চৌধুরী সাহেবকে দাওয়াত করলেন সাল ১৯৮৬। আমি ছাড়াও ময়মনসিংহ জামাতের আরও দুই তিনজন মরহুমের সফর সঙ্গী ছিলাম। বাজারের মাঝখানের কাঠ ও টিন দিয়ে তৈরী দোতলার এক পাশে মসজিদ এবং অন্য পাশে থাকার জন্য বিছানা ও জামাতি বই পুস্তকে ভরা আলমারি ছিল। নীচের ঘরে কবিরাজী ঔষধালয় ও সামনে সারিবদ্ধ দোকান দিয়ে ঘেরা ফাকা জায়গা। মাইকিং করে করে লোকদেরকে একত্রিত করা হচ্ছিল। যথারীতি মরহুম চৌধুরী সাহেবের বক্তৃতা শুরু হল–বিষয় "একই ধর্ম যুগে যুগে"। লোকে লোকারণ্য যার অধিকাংশই গায়ের আহমদী ও হিন্দু শ্রোতা। দোকান পাট বাজার-ঘাট সবকিছু বন্ধ করে সবাই তন্ময় হয়ে শুনছে বেদ, গীতা, মহাভারত, উপনীষদ, ত্রিপিটক, বাইবেল, জিন্দাবেস্তায় লুকিয়ে থাকা হারানো সত্যকে আলকুরআনের নূরের আলোকে উদঘাটিত ও উদভাসিত হৃদ'য় নিংড়ানো যুক্তি ও ভালবাসা পূর্ণ মহাসত্যের অমৃত ধারা। পিন পতন স্তব্ধতার মধ্যে তার তেজস্বী বাগ্মিতার স্রোত ধারায় জলদ গম্ভীর সুরে কলি যুগের কল্কি অবতার, নব যুগের মাহ্দী ও মসীহের আগমনী বার্তা লাউড-স্পিকারে যখন আকাশে বাতাসে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল তখন মনে হচ্ছিল ধন প্রাণ সব কিছু উজাড় করে দিয়ে মসীহ্র বার্তা নিয়ে দ্বারে দ্বারে ঘুরি।

১৯৫৭ সালে যে মহাসত্যকে তিনি গ্রহণ করেছিলেন সারা জীবন সেই মহাসত্যকে ধারণ করেছেন, লালন করেছেন, সর্বশক্তি দিয়ে বিরামহীনভাবে তা প্রচার করে বেড়িয়েছেন দেশ থেকে দেশান্তরে। দেশের ভেতরে জলসা, সভা, সমাবেশ, সেমিনারে সবাই যেমন অধীর আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করতো-মরহুম চৌধুরী সাহেবের হৃদয়গ্রাহী মর্মস্পর্শী বক্তৃতা শোনার জন্য, দেশের বাইরে ঠিক তেমনি সমানভাবে সমাদৃত ছিলেন। প্রবাদ তুল্য তার এই বক্তৃতার ধ্বনি মরহুম মৌলভী সলিমুল্লাহ্ সাহেবের শহিদী গজলের মধে প্রতিনিয়ত বাংলার আকাশে বাতাসে প্রতিধ্বনিত হতে থাকবে ঠিক এভাবে "বিংশ শতের তেষট্টি আজি তেসরা নভেম্বর, সাতচল্লিশা সালানা জলসা ব্রাহ্মণবাড়িয়ার পর। সন্ধ্যার পরে বক্তৃতা করে আহমদ তৌফিক, ইমাম মাহদী আসিয়াছে ভবে, দলীল প্রমাণে ঠিক" আহমদীয়াত গ্রহণের মাত্র ৮ বছরের মাথায় তিনি এ ব্যাপারে এত বড় বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠেছিলেন যে উপরের চরণ কটি তার বড় প্রমাণ। যুগ মসীহের আগমনী বার্তা প্রচারের জন্য তিনি বহুদেশে ঘুরেছেন। কখনো বা স্বপ্রনোদিত আবার কখনো আমন্ত্রিত হয়ে। সবাইকে ইমাম মাহদী (আঃ) এর আহ্বান শুনানোর জন্য সর্বদাই তিনি ব্যাকুল থাকতেন। ১৯৮৬ সালের এক সন্ধ্যায় তিনি প্রস্তাব করলেন বাংলাদেশের প্রতিটি উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের প্রধানদের নামে ডাক যোগে তবলিগী বই পুস্তক প্রেরণ করতে হবে। সমস্ত খরচ তিনি বহন করবেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে তবলিগী বইগুলোর অধিকাংশই তার নিজস্ব পাবলিকেশনের (কাসরে সলিব পাবলিকেশন)। ঠিকানা যোগার করে শুরু হলো কাজ। বইগুলি কাগজ দিয়ে মুড়ে কখনো তিনি আঠা লাগাতেন, টিকিট লাগাতেন-আমি ঠিকানা লিখতাম, আর কখনো তিনি ঠিকানা লিখতেন আর আমি আঠা লাগাতাম টিকিট লাগাতাম। দিনের অন্য সময়ে তিনি এই কাজগুলি করতেন। এভাবে সব উপজেলা শেষ না হওয়া পর্যন্ত তিনি ক্ষান্ত হলেন না।

পবিত্র মাহে রমজানে সে সময় ময়মনসিংহে প্রতিদিন বাদ আছরের পরে পবিত্র কুরআনের দরস, ইফতারী ও বাজামাত মাগরীবের ব্যবস্থা ছিল। এক এক দিন এক এক বাসা ঘুরে ঘুরে এই দরস ও ইফতারী হতো। জামাতের সদস্যরা ছাড়াও অনেক গয়ের আহমদীও থাকতো। দরস দিতেন মরহুম চৌধুরী সাহেব। আলকুরআনের তত্ত্ব, তথ্য ও বিধিনিষেধ সমূহকে তিনি ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান, ভূগোল বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্র সাহিত্য ও সাময়ীকির আলোকে এত সুন্দর ও জ্যোতির্ময় করে তুলে ধরতেন যে সবাই শুনে চমৎকৃত হয়ে যেত, বিগলিত হয়ে যেত। আল কুরআনের অসাধারণ ও গভীর জ্ঞান রাখতেন তিনি। পূর্বেই উল্লেখ করেছি আমি সে সময় সাময়িক বরখাস্থ অবস্থায় ছিলাম। অর্ধেক বেতন ভাতা পেতাম। টিউশনি করে অতিরিক্ত ৬০০/= টাকা থেকে ৮০০/= টাকা পেতাম। ফলে আল্লাহ্র রহমতে ভালই চলত। মরহুম চৌধুরী সাহেব আমার অসুবিধার কথা ভেবে বললেন-ইফতার তো সবাই মিলে এক সঙ্গে করছি। বাদ মাগরিব একসঙ্গে আমার বাসায় ফিরে খাওয়া দাওয়া করে মেসে যাবেন। এভাবে পুরা রমযান মাস অত্যন্ত আন্তরিক আতিথেয়তার সাথে আমাকে তার বাসায় সুস্বাদু খাবার খেতে বাধ্য করলেন। অনেক সময় ধর্মীয় আলোচনায় যদি বেশি রাত হয়ে যেত, তবে তিনি বলতেন মেসে যেয়ে আর কি করবেন, রাতে এখানে থাকুন। বিছানা ঠিক ঠাক করে দিয়ে সিলিং ফ্যান থাকার পরও মাথার কাছে টেবিল ফ্যানের ব্যবস্থা করে দিতেন। তিনি শুধু আদর-স্নেহ করতেন তাই নয় বরং ততোধিক হারে শ্রদ্ধা ও সম্মানও করতেন। আমি ময়মনসিংহে তার অধীনে প্রায় ২ বছর জামাতের সেক্রেটারী মাল হিসেবে কাজ করার সুযোগ পেয়েছি। আমার অনেক ভুলত্রুটি দুর্বলতা থাকা সত্ত্বেও কোন কাজে কোন সময় তাকে সামান্য পরিমাণ অসন্তুষ্ট বা রাগতে দেখিনি। সবসময় তিনি সহাস্য বদনে কথা বলতেন অত্যন্ত সুন্দর করে শ্রুতিমধুর চলতি বাংলায়। কথা বলতেন বাংলাদেশের বিভিন্ন জামাতের ইতিহাস, মোখালেফাত ইত্যাদি বিভিন্ন ঘটনা নিয়ে। কথা বলতেন তিনি কি ভাবে খ্রীষ্টান হতে হতে আহমদীয়ত তথা খাঁটি ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য অর্জন করলেন। সে এক আকর্ষণীয় কাহিনী, কলেবর বৃদ্ধির কারণে সে ঘটনা বর্ণনা করা থেকে বিরত থাকলাম। তিনি তার পরবর্তী প্রজন্মকে আহমদীয়াতের উপর কায়েম রাখার জন্য কার্যকরী পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। তার এক ছেলে তিন মেয়েকে দুনিয়াবী শিক্ষার পাশাপাশি ধর্মীয় শিক্ষা ও অনুশাসনাদি কঠোরভাবে মেনে চলার জন্য পিতা হিসাবে তার ভূমিকা ছিল আপোষহীন। আহমদীয়াতের ব্যাপারে আপোষহীন মনোভাবের কারণে তার একমাত্র পুত্র আহমদ তবশীর চৌধুরী আল্লাহ্তাআলার দয়ায় মজলিসে আনসারুল্লাহ্ বাংলাদেশের সদর হওয়ার গৌরব অর্জন করেছেন। মরহুম খেলাফত ও নেযামের প্রতি ছিলেন একান্ত অনুগত, বিশ্বস্থ। জামাতের সমস্ত ফয়সালা অম্লান বদনে হাসি মুখে মেনে নিতেন। কোন কর্মকর্তার সমালোচনাকে তিনি পছন্দ করতেন না। ফলশ্রুতিতে মহান আল্লাহ্ এই দুনিয়াতেই মরহুমকে বিভিন্ন পুরস্কারে ভূষিত করেছেন। প্রথমে সেলবরস জামাতের প্রেসিডেন্ট, পরে ময়মনসিংহের প্রেসিডেন্ট, তৎকালীন সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানের খোদ্দাম প্রধান, কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী, নায়েব আমীর পরবর্তীতে ন্যাশনাল আমীর হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। মহান এই সাধক প্রায় শতাদিক বইয়ের লেখক, গবেষক, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, ভাষাবিদ, তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ববিদ ১০/০৮/০৫ ইং তারিখে তার মহান প্রিয় প্রভুর উদ্দেশ্যে পরলোকে পাড়ি জমান।। মহান আল্লাহ্ জান্নাতে তাকে অতি উচ্চ মোকাম দান করুন। আমীন।

খন্দকার মাহবুব-উল-ইসলাম

সন্তানের প্রতি বাবা-মায়ের করণীয়

মানব-মানবীর সংসার জীবনে পূর্ণতা অর্জিত হয় সন্তান-সন্ততির আগমনে। সন্তান-সন্ততি সংসার নামক বাগিচার শোভা বর্ধনকারী ফুল। সন্তান-সতি সংসার জীবনের সৌন্দর্য এবং হৃদয়ের প্রশান্তি লাভের খোদায়ী নিয়ামত। পবিত্র কুরআনের ব্যক্ত হয়েছে **"ওয়াল বানূনা যীনাতুল হায়াতিদ্দুনইয়া।"** অর্থ- এবং সন্তান-সন্ততি তোমাদের জন্য পার্থিব সৌন্দর্য (সূরাতুল কাহাফ-৪৭)।

ডিম পুষ্টি মানে সমৃদ্ধশালী খাদ্য। ডিমের সংমিশ্রণে যাবতীয় খাদ্যের স্বাদ বৃদ্ধি হয়। কিন্তু পচা ডিমের দুর্গন্ধে মানুষ নাকে রুমাল দিতে বাধ্য হয়। পানির অপর নাম জীবন। আবার আর্সেনিকযুক্ত হলে জীবন রক্ষাকারী পানিই মরণ ফাঁদে পরিণত হয়। লাল রং লাগিয়ে আর্সেনিযুক্ত টিউবয়েলগুলোকে চিহ্নিত করে মানুষকে বলা হয় এ পানি পান করবে না এটা মরণ ব্যাধি সৃষ্টিকারী।

আমরা যদি সন্তান-সন্ততির মাঝে প্রকৃতগতভাবে বিদ্যমান ইসলামী ফিৎরাতকে বিকশিত করতে অক্ষম হই তবে শয়তানী ফিৎরাত বাসা বাঁধবে। এর ফলে সন্তান-সন্ততি যৌবনে পদার্পণ করে মাস্তান, হাইজ্যাকার, ছিনতাইকারী, খুনি, চোর, ডাকাত, হারামখোর, সুদখোর, ঘোষখোর, মদখোর, জুয়ারী পরিশেষে নাস্তিকে পরিণত হবে। এমতাবস্থায় মা-বাবার চোখের পানি ফেলা ছাড়া আর কিছুই করার থাকবে না। সন্তানের মালিক হওয়া যেমন আনন্দের তেমনি নিরানন্দেরও বটে। বিষয়টি পবিত্র কুরআনের ভাষায় "এবং জেনে রাখ যে, নিশ্চয় তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি (তোমাদের জন্য) পরীক্ষাস্বরূপ; এবং নিশ্চয় আল্লাহ্ তিনিই যার নিকট রয়েছে মহাপুরস্কার।" (সূরাতুল আনফাল-২৯)

সন্তান-সন্ততির প্রতি, দায়িত্ব কর্তব্য পালনের পরীক্ষায় কৃতকার্যতা অবলম্বনের কৌশল সম্বন্ধে কুরআনুল করীমে বর্ণিত হয়েছে ঃ-**"ওয়াল্লাযীনা ইয়কুলুনা রাব্বানা হাবলনা মিন আযওয়াজিনা ওয়া যুররী ঈয়াতিনা কুররাতা আ'ইউনিও ওয়াজয়ালনা লিল মুত্তাকিনা ইমামা"** (সূরাতুল ফুরকান ৭৫)। অর্থ-এবং যারা বলে, হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদেরকে আমাদের সন্তান-সন্ততি ও স্ত্রীর মাধ্যমে নয়নের স্নিগ্ধতা দান করো এবং আমাদেরকে মুত্তাকীগণের ইমাম বানিয়ে দাও।" আমার একজন শিক্ষক, বলেছেন যে, আমি তখন ছাত্র জীবনে, একজন দরবেশ প্রকৃতির ব্যক্তি আমাকে ডেকে বলেছিলেন। তুমি এখন হতে নিয়মিত সূরাতুল ফুরকানের পঁচাত্তর নম্বর আয়াতটি পাঠ করবে। শিক্ষক আরো বলেন যে, ঐ সময় এ দোয়া পাঠ করার তাৎপর্য বুঝতে পারিনি। কিন্তু যখন বিবাহ করে সংসার মাত্র আরম্ভ করলাম, তখন বুঝলাম, সত্যই সন্তান-সন্ততি দ্বারা হৃদয়ের প্রশান্তি বা নয়নের স্নিগ্ধতার জন্য নেক স্ত্রীর প্রয়োজনীয়তা কত ব্যাপক। পুরুষ হিসেবে সন্তান-সন্ততির প্রতি দায়িত্ব-কর্তব্য পালনের প্রথম এবং প্রধান শর্ত হলো, এমন একজন নেক পুণ্যবতী মহিলার সহিত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া যিনি ধর্মের বিধি বিধান পালনে শ্রদ্ধাশীলা। কেননা, সন্তান-সন্ততি সর্বাগ্রে মায়ের চাল-চলনকে নকল করে থাকে।

রসূলে করীম (সঃ) বলেছেন ঃ-"**আল জান্নাতু তাহতা আকদামী উম্মাহাতিকুম।**" তোমাদের মায়ের পায়ের নিচে তোমাদের জান্নাত।" যে মায়ের পদতলে আমাদের সন্তান-সন্ততির জান্নাত অন্বেষন করতে বলা হয়েছে, সে মাকে স্ত্রী হিসেবে বরণ করে গৃহে আনার পূর্বে অবশ্যই মায়ের পদযুগল জান্নাত লাভের যোগ্য কিনা সেটা বিচার বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে। এ বিচার-বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে রসূলে করীম (সঃ)-এর নিম্নে উল্লেখিত নসিহতটিকে সামনে রাখা অপরিহার্য। তিনি (সঃ) বলেছেন ঃ- "স্ত্রী নির্বাচনের ক্ষেত্রে মানুষ চারটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখে কেউ তার রূপ লাবন্য, কেউ তার ধন-দৌলত, কেউ আবার তার বংশ বা আভিজাত্য আর কেউ তার ধর্মপরায়ণতার প্রতি দৃষ্টি দিয়ে থাকে। (হে মুসলিম যুবকগণ!) তোমরা ধর্মপরায়ণতাকে অগ্রাধিকার প্রদান কর, নচেৎ তোমাদের চেহারাতে ধূলা লেগে থাকবে। (বুখারী)। কামরুল আম্বিয়া হযরত মির্যা বশির আহমদ (রাঃ) বলেছেন - "পুণ্যবান সন্তান-সন্ততি লাভ করতে পূণ্যবতী মা অপেক্ষা বড় আর কোন বস্তু অদ্যবদি আবিষ্কার হয়নি।" (পাক্ষিক আহমদী)। মনে রাখবেন, সন্তান-সন্ততির প্রতি অর্পিত গুরু দায়িত্ব পালন করতে হলে স্বামী-স্ত্রীর দুটো দেহ, মন, বিশ্বাস এবং আমলকে এক বৃত্তে রূপান্তর করা আবশ্যক। দুটো জীবনকে এক বৃত্তে রূপান্তর করার জন্য যুবকদের ন্যায় প্রত্যেহ প্রত্যেক যুবতীকে নিম্নের দোয়াটি পাঠ করা প্রয়োজন। **রাব্বানা হাবলানা মিন্ আয্ওয়াজিনা ওয়া যুররীয়াতীনা কুররাতা আ'ইউনিন"** "হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদিগকে আমাদের সন্তান-সন্ততী ও আমাদের স্বামীর মাধ্যমে নয়নের স্নিগ্ধতা প্রদান করো"। কোন মানুষ আল্লাহ্র দরবারে প্রার্থনা করবে আর তা কবুল হবে না এমনটি হতে পারে না। কেননা পবিত্র কুরআনে অল্লাহ্তাআলা ঘোষণা করেছেন : আমি তোমাদের মধ্যে কর্মনিষ্ঠ কোন নর বা নারীর কর্ম বিফল করি না। তোমরা একে অপরের অংশ"। (সূরাতুল ইমরান-১৯৬)।

সন্তান-সন্ততি আল্লাহ্র পক্ষ হতে আমাদের নিকট আমানত। এ আমানতের হেফাজতের দায়িত্ব কর্তব্য অনেক ব্যাপক। যা বিস্তারিত বর্ণনা করতে বিশালাকারের একটি পুস্তক প্রয়োজন। যাই হোক আমাদের সমাজে স্বামী স্ত্রীর দাম্পত্য কলহের বিষ ক্রিয়াতে আক্রান্ত হয়ে প্রতিনিয়ত কিভাবে হাজার হাজার শিশুর ভবিষ্যত জীবন প্রদীপ নীভে যাচ্ছে একটি উদাহরণ দিয়ে,আজকের প্রবন্ধের ইতি টানছি।

মোহাতাব খানঃ অধ্যাপক মনোবিজ্ঞান বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় । সন্তান-সন্ততির উপর দাম্পত্য প্রভাব নিয়ে ভাবছেন কি? শিরোনামে লিখেছেন ঃ- কয়েকদিন পূর্বে মায়ের সঙ্গে আমার কাছে এসেছিল ১৬ বছরের একমাত্র সন্তান তুষার (আসল নাম নয়)। মায়ের অভিযোগ তার সন্তান লেখাপড়াতে অত্যন্ত অমনোযোগী। পড়তে বসে সর্বক্ষণ কি যেন ভাবে। স্কুলের পরীক্ষার ফলাফল মোটেও ভাল নয়। এদিকে তুষারের সামনে মেট্রিক পরীক্ষা। তাই ওর মা এখন খুব চিন্তায় রয়েছে। ওর সমস্যা শোনার পর তুষারের সঙ্গেও আলাদা বসে তার অসুবিধা গুলি বুঝতে চেষ্টা করি। ওর সঙ্গে কথা বলার পর যেটা বেড়িয়ে এলো সেটা হচ্ছে, তুষারের ছেলে বেলার অভিজ্ঞতায় রয়েছে প্রচন্ড অনিশ্চয়তা ও ভয়ের অনুভূতি। ছোট্ট তুষার মা-বাবার ঘরের বাইরে বসে শুনতে পেত তাদের মধ্যে প্রচন্ড কথা কাটাকাটি হচ্ছে। মাঝে সধ্যে তুষারের নাম উচ্চারিত হত সেই ঝগড়ার কোন এক পর্যায়ে। কিছুক্ষণ পর তাদের মধ্যে হাতাহাতি মারামারি শুরু হতো। চার পাঁচ বছরের ছোট্ট তুষার ভাবত ও কি কোন দোষ করেছে, যেটা নিয়ে মা-বাবার মধ্যে রাগারাগি হচ্ছে। কখনও কখনও ওর মনে হতো বাবা-মায়ের মধ্যে সম্পর্ক মোটেও ভাল নেই, তাই তারা সারাক্ষণ ঝগড়ার করছেন। ওর অসহায় ছোট্ট মনটির মাঝে অনেক কষ্ট জমতে থাকে দিনের পর দিন।

তুষার শুধু ভাবত কি করে বাবা-মায়ের মধ্যে ভাব সৃষ্টি করা যায়, কি করে খুব লক্ষী হয়ে ওদের খুশী করা যায়। কিন্তু এর চেয়ে বেশি কিছু ভাবার মতো সময় কখনও ওর হয়নি। আস্তে আস্তে বড় হবার পর ও বুঝতে পেরেছে, মা-বাবার মধ্যে যে মানসিক দূরত্ব রয়েছে সে ব্যাপারে তুষারের কিছুই করার নেই। মাঝে মধ্যে প্রতিবাদ করা এবং কষ্ট পাওয়া ছাড়া আর কি-ই বা করতে পারে সে। বড় হবার পর ও যখন বন্ধু বান্ধবদের বাসায় গিয়েছে, তখন ওদের মা-বাবাকে হাসিখুশী দেখে মনে হয়েছে ওর মা-বাবা কেন ওদের মত হাসে না? কেন ওরা দুজন দুজনকে ভালবাসে না? কেন এরা সর্বক্ষণ শুধু পরস্পরের দোষ খুঁজে বেড়ায় এবং একজনের অসুবিধার জন্য অন্যজনকে দায়ী করে? পড়ার টেবিলে বসে কখন যে তুষার নিজের মধ্যে হারিয়ে যায় সেটা নিজেও বুঝতে পারে না। নিজেকে বড্ড অসহায় ও একা মনে হয়, আর প্রায়ই মরে যেতে ইচ্ছে করে।

আমরা বুঝতে পেরেছি তুষারের বর্তমান অবস্থাটা তার জন্য কত পীড়াদায়ক। মনের এই অবস্থায় তার পক্ষে লেখা পড়ায় মনোযোগ দেওয়া মোটেই সম্ভব হচ্ছে না। তুষারের কথা শোনার পর ওর মায়ের সঙ্গে আবার আলোচনার সময় আমি তাকে বললাম, তিনি এবং তার স্বামী যদি অন্তত ছেলের কথা চিন্তা করে মারিটাল কাউন্সিলিং নেন তবে ভাল হয়। এর মধ্যে তুষারের যথেষ্ট ক্ষতি হয়েছে তারও থেরাপির প্রয়োজন আছে এবং সেই সঙ্গেও তাদের দাম্পত্য সম্পর্ক উন্নয়নের অবশ্যই প্রয়োজন রয়েছে। তুষারের মা প্রথমে মানতে চান নি যে, তাদের দাম্পত্য সম্পর্কের প্রভাব সন্তানের ওপর পড়তে পারে। তবে পরে তিনি অনেক কথা কাটাকাটি করে স্বীকার করেছেন যে, সত্যিই তাদের দুজনের সম্পর্কের কারণে তাদের একমাত্র আদরের সন্তানের মধ্যে নিরাপত্তাহীনতার অনুভূতি তৈরি করতে পারে। বাবা মায়ের দ্বন্দ্ব নিয়ে তুষারের ন্যায় সমস্যায় আরো অনেককেই পাচ্ছি। এদের কেহ কেহ স্বেচ্ছায় আমার নিকট এসেছে। এরা প্রাপ্ত বয়স্ক এরা প্রথম সেশনগুলোতে অন্যান্য সমস্যার কথা বলেছে। আস্তে আস্তে সমস্যার গভীরে যাওয়ার সময় একটি পর্যায়ে এসে তাদের বাড়ির পরিবেশ এবং বিশেষ করে বাবা-মায়ের সম্পর্কের মধ্যে সমস্যাগুলো তারা উল্লেখ করেছে। এই কথাগুলো বলার সময় আমি লক্ষ্য করেছি, কতটা বিষন্নতা আর অসহায়ত্বের ছাপ ফুটে উঠেছে তাদের চোখে মুখে।

গবেষণায় দেখা গেছে, যখন স্বামী-স্ত্রী তাদের পারস্পরিক মতবিরোধ নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে অন্যজনের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধা দেখিয়ে ভালো একটা সমাধানে পৌঁছতে ব্যর্থ হন এবং স্বীয় মতামতকেই প্রতিষ্ঠিত করতে থাকেন তখন তাদের সন্তানেরা খুব মুচড়ে পড়ে। প্রতিটি দম্পতিরই কিছু বিষয়ে মতামতের পার্থক্য থাকাটা স্বাভাবিক এবং অনেক ব্যাপারেই এর কোন সহজ সমাধানও নেই। দেখা যায়, মতানৈক্য হলে দম্পতিরা এতটাই আবেগ প্রবণ হয়ে পড়ে যে, বিষয়টিকে আর সুস্থভাবে সামলিতে পারে না। তারা হয়তো সব সময় পরস্পরের প্রতি ততটা আক্রমণাত্মক বা রাগান্বিত হচ্ছে না, কিন্তু তারপরও অন্যজন সম্পর্কে এমন কিছু কথা বলে দিচ্ছে যে, যার ফলে তাদের পারস্পরিক শ্রদ্ধা, আস্থা ও ভালবাসা দিনে দিনে কমে যাচ্ছে, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কত ঘন ঘন তর্ক-বিতর্ক হচ্ছে, ঝগড়ার সময় তারা কি ধরনের ভাষা ব্যবহার করছে, কিভাবে পরস্পরকে দোষারোপ করছে, নিজেদের মধ্যে কথা বন্ধ রাখছে কিনা এ ব্যাপারগুলো সন্তানের মনে অত্যন্ত সুদূর প্রসারী প্রভাব বিস্তার করে।

যখন স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে দৈহিক সহিংসতা ঘটে তখন সন্তানেরা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অনেক সময় তারা জিনিসপত্র ভাঙ্গচুর করে অথবা একজন অপরজনকে এমনভাবে নির্যাতন করে যে, তাদের শরীরে বেশ কিছুদিন পর্যন্ত সেটার চিহ্নও থেকে যায়। এর ফলে অনেক সময় ডাক্তার পর্যন্ত ডাকতে হয়। যুক্তরাষ্ট্রে পরিচালিত একটি গবেষণায় দেখা গেছে, সেখানে শতকরা চল্লিশ ভাগ দম্পতির মধ্যে এ ধরনের নির্যাতনের ঘটনা রয়েছে। দুঃখের ব্যাপার হচ্ছে, বাবা-মায়েরা এ ব্যাপারটা খেয়াল করেন না যে, তাদের কোমল মনের শিশু সন্তানরা তাকিয়ে তাকিয়ে তাদের আক্রমণাত্মক ভূমিকা দেখছে। অনেক সময় তারা জেদের বসে সন্তানদের সাক্ষী হিসেবে ব্যবহার করেন। যদি সন্তানরা এসব ঘটনার সময় সামনে উপস্থিত না-ও থাকে তারপরও তাদের কাছে পরে ঘটনাটি সবিস্তারে বর্ণনা করা হয়। গবেষণায় এটাও পাওয়া গেছে যে, সন্তানেরা শৈশবে দেখা এ দৃশ্যগুলো সারা জীবন ভুলতে পারছে না, এর ফলে তারা লেখাপড়ায় মনোযোগ দিতে ব্যর্থ হয় এবং বন্ধু বান্ধবের সাথে সুসম্পর্ক তৈরীতেও তাদের অসুবিধা হয়। দেখা গেছে মেয়ে শিশুরা এসব ঘটনা প্রত্যক্ষের ফলে অত্যন্ত নিরাপত্তাহীনতা ও বিষন্নতায় ভোগে। আর ছেলে শিশুরা বড় হয়ে অত্যন্ত আক্রমণাত্মক হয়ে উঠে। দম্পতিরা যখন একজন অপরজন দ্বারা খুব বেশি নির্যাতিত হয়, তখন যে বেশি নির্যাতনের শিকার হচ্ছে,সন্তানেরা তাকে মানসিক সহায়তা দিতে খুব চেষ্টা করে এবং এর ফলে দেখা যায় তারা শৈশবেই বড়দের মতো আচরণ করতে শুরু করে। এই সন্তানদের তখন শৈশবকাল বলতে আর কিছুই থাকে না। অসুখী দম্পতিরা বিষন্নতায় ভোগে বলে তারা সংসারের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ে এবং অনেক সময় তারা বিভিন্ন ধরনের আসক্তিতে জড়িয়ে পড়ে। এর ফলে সন্তানরা বাড়িতে একটি নিরানন্দ পরিবেশে বড় হতে থাকে।

খুব স্বাভাবিক কারণেই দাম্পত্য সমস্যার প্রতিফলন ঘটে সন্তান লালনপালনের ক্ষেত্রেও। গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলে দেখা গেছে, এই বাবা-মায়েরা সন্তানদের ব্যাপারে খুব বেশি সমালোচনা মুখর হন এবং তাদের শৃঙ্খলা শিখানোর ব্যাপারেও অসামঞ্জস্যপূর্ণ আচরণ করেন। আরো দেখা গেছে, যে সব পিতা দাম্পত্য জীবনে নিজেকে অসুখী মনে করেন তারা তাদের কন্যা সন্তানদের প্রতি অত্যন্ত নেতিচাক আচরণ করেন। এর কারণ হিসাবে বলা হয়েছে তাদের কন্যা সন্তানরা তাদের নিজের স্ত্রীর কথা মনে করিয়ে দেয় যিনি তাকে দাম্পত্য জীবনে সন্তুষ্ট করতে পারেন নি। এই পিতারা পরিবার থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখেন এবং ধীরে ধীরে অন্য সন্তানদের সঙ্গেও কথা বার্তা কমিয়ে দেন।

গত দশ বছর ধরে যে সব গবেষণা হয়েছে, তাতে দেখা গিয়েছে যে, সব বয়সের সন্তানরাই বাবা-মায়ের তর্ক-বিতর্ক চলাকালীন সময়ে মানসিকভাবে খুব বেশি পরিমাণে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। বড় হওয়ার পর এই সন্তানদের যখন কারো সাথে মতবিরোধ হয়,তখন তারা ভীষণভাবে ভেঙ্গে পড়ে এবং দুশ্চিন্তায় ভুগতে থাকে। একটি গবেষণায় পাওয়া গেছে, সন্তানরা যখন বাবা-মায়ের মধ্যে খুব বেশি ঝগড়া বা মারামারি দেখে, তখন তারা সব সময় উদ্বিগ্ন থাকে এই ভেবে যে, বোধ হয় আবার তারা আক্রমণাত্মক আচরণে জড়িয়ে পড়বেন। স্কুলের একটি ছেলের কেস স্টাডি পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, ছেলেটি প্রায়ই স্কুল পালিয়ে বাসায় চলে যেত। শিক্ষকগণ এতে চিন্তিত হয়ে এর কারণ বুঝতে চাইলেন, এবং জানতে পেলেন যে ছেলেটি স্কুলে আসার সময় প্রায় প্রতিদিন তার বাবা-মায়ের কথা কাটাকাটি শোনতে পেত। তার মা সব সময় তার বাবাকে হুমকী দিত যে তিনি বাড়ী ছেড়ে চলে যাবেন। ছেলেটি তার মাকে ভীষণ ভালবাসত, আর তাই স্কুলে মন বসানো তার পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ত। তার শুধু মনে হতো বাড়ি ফিরে সে আর মাকে দেখতে পাবে না, আর এই কারণেই সে স্কুল পালিয়ে আগে ভাগে বাড়ী যেত।

পৃথিবীর কোন মা-বাবাই চান না ইচ্ছে করে তাদের সন্তানদের আঘাত করতে। তবে খুব অল্প সংখ্যক মা-বাবা হয়তো জানেন, তাদের মধ্যকার দ্বন্দ্ব ও দূরত্ব তাদের সন্তানের জন্য কতটা ক্ষতিকর হতে পারে। বাব-মা যেহেতু সন্তানদের পৃথিবীতে নিয়ে এসেছেন, তাই তাদের অবশ্যই অনেক বেশি দায়িত্বশীল আচরণ করতে হবে। তা না হলে এর ক্ষতিকর প্রভাব বংশপরাম্পরায় চলতে থাকবে। (দৈনিক জনকণ্ঠ)

বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের কারণগুলোর অন্যতম প্রধান কারণ হলো সন্তান-সন্ততির মাধ্যমে বংশের ধারাকে রক্ষা করা। স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য কলহের কুপ্রভাবে বংশ রক্ষার প্রদীপ যদি অকালে নিভে যায়, তবে আর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবার সার্থকতা কোথায়? বিবাহ বন্ধনের স্বার্থকতা রক্ষার জন্য সূচনালগ্নে উভয়কে খুব চিন্তা-ভাবনা করে সামনে অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন। শত সাবধানতার পরেও বিবাহ উত্তর দাম্পত্য জীবনে কিছু সমস্যা সৃষ্টি হওয়াটা অস্বাভাবিক নয়। কথায় বলে, মাটির কলসী পাশা পাশি অবস্থান করলে একটু আধটু টুকা লাগেই, তবে লক্ষ্য করার বিষয় হলো, টুকাতে যেন কলসী ভেঙ্গে না যায়। দাম্পত্য জীবনে ছোট খাঁট সমস্যাগুলো সমাজ, পরিবার তথা সন্তান-সন্ততির আগোচরে সমাধান করতে পারলেই কেবল ভাঙ্গা-ভাঙ্গীর হাত হতে রক্ষা পাওয়া সম্ভব। আর এটাই সন্তান-সন্ততির তরবীয়তি দায়িত্ব পালনে মা-বাবার করণীয় প্রধান কর্ম।

মোহাম্মাদ মজিদুল ইসলাম
মোয়াল্লেম

তারুয়া গ্রামের মৌলবী আহমদ আলী

(দ্বিতীয় কিস্তি)

অতিথি আপ্যায়নকারী হিসেবে বাবাকে প্রথম সারিতে ফেললে একটুও অতিরঞ্জিত করা হবে না। জামাতি অতিথি, বাইরের হিন্দু-মুসলমান সবাইকে বাবা সানন্দে আপ্যায়ন করতেন। মিষ্টি হাসি, অমায়িক ব্যবহার এবং নিত্য উপার্জনের অর্থ থেকে যথাসাধ্য চেষ্টায় অতিথিকে সন্তুষ্ট করতেন। জামাতের প্রথম সারির অতিথিদের মাঝে ছিলেন আহমদীয়া মুসলিম জামাতের খলীফা হযরত মির্যা তাহের আহমদ(রাহেঃ), হুযূর যখন আহমদীয়া জামাতের যুবসংগঠন, খোদ্দামুল আহমদীয়ার প্রধান ছিলেন তখন ১৯৬৪ সনে তারুয়া জামাত সফরে এসে বাবার আতিথ্য গ্রহণ করে তাঁকে ধন্য করেন। বর্তমান লন্ডন মসজিদের ইমাম মাওলানা আতাউল মুজিব রাশেদের পিতা মাওলানা আবুল আতা জলন্ধরী সাহেব দু'বার (১৯৬৪ ও ১৯৬৯ইং) আমাদের বাড়ির আতিথ্য গ্রহণ করেন। শুনেছি জামাতের বাইরে অতিথি হয়ে এসেছিলেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভাইস চ্যান্সেলর ও সাবেক রাষ্ট্রদূত এ আর মল্লিক। এ আর মল্লিক আমার মেঝ চাচার বন্ধু ছিলেন বিধায় আমাদের বাড়ীতে বেড়াতে এসেছিলেন।

উল্লেখ্য, ১৯৩৭ সন থেকে ২০০৪ইং পর্যন্ত তারুয়া আহমদীয়া জামাতে জলসা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। আগে মাঝে মাঝে আহমদীয়া মুসলিম জামাত তারুয়ার বার্ষিক সম্মেলন (জলসা) অনুষ্ঠিত হতো আমাদের বাড়ির বাংলা ঘরের সামনের মাঠে। বর্তমানে তারুয়া আহমদীয়া জামাতের সালানা জলসা মসজিদের মাঠে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। কত সন থেকে বাবা তারুয়া আহমদীয়া মুসলিম জামাতের প্রেসিডেন্ট ছিলেন তা জানি না কিন্তু আমাদের ছোট বেলা থেকে ১৯৮৯ সন পর্যন্ত বাবা তারুয়া জামাতের বার্ষিক সালানা জলসার উদ্বোধনী ও সমাপনী ভাষণ দিতেন। আমরা তারুয়াবাসী আহমদীরা সবাই অধীর আগ্রহে সবাই অপেক্ষা করতাম কখন সেই হৃদয়গ্রাহী ভাষণ দিবেন। বাবা কোন লিখিত ভাষণ দিতেন না। কিন্তু কুরআন শরীফের সূরা সুললিত কণ্ঠে পাঠ করতেন। এবং নিজের মন থেকে কথা গুছিয়ে বলতেন। উপস্থিত শ্রোতা এবং গ্রামবাসী তা হৃদয় ভরে শুনতেন।

তারুয়া উচ্চ মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা বাবার জনসেবার একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ১৯৬৯ সনে আমাদের ছোট চাচা মরহুম সিদ্দিক আলী (লন্ডন প্রবাসী) দেশে আসেন। এসেই গ্রামে মেয়েদের শিক্ষা প্রসারের জন্য বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করার কথা ব্যক্ত করেন। সেই বছর সেপ্টেম্বরে ছোটচাচার ইচ্ছা ও বাবার প্রচেষ্টায় ৫ জন মাত্র ছাত্রী নিয়ে আমাদের বাংলা ঘরে বিদ্যালয়ের কার্যক্রম শুরু হয়। সিদ্দিক আলী নারী শিক্ষার যে বৃক্ষটি রোপণ করেছিলেন তার পরিচর্যার ভার গ্রহণ করেছিলেন আমার বাবা মরহুম মৌঃ আহমদ আলী। সেই বিদ্যালয় আজ মহা মহীরূহতে পরিণত হয়েছে। চারদিকে ডাল পালা মেলে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে শিক্ষা বিস্তার করে চলেছে। আজ বিদ্যালয়টি বিভিন্ন গ্রামের ছাত্রীতে পরিপূর্ণ। এটি বর্তমানে একটি পূর্ণাঙ্গ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রী আহমদ আলীর সুযোগ্য কন্যা নীনা আহমদ কানাডাতে ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। ২০০৩ সনে বিদ্যালয়টি উপজেলার শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবে স্বীকৃতি পায় এবং প্রধান শিক্ষিকা নুসরাত জাহান উপজেলার শ্রেষ্ঠ প্রধান শিক্ষিকা হিসেবে স্বীকৃতি পায়।

বাবা ছিলেন উদার প্রাণ মানুষ। তিনি সব ধর্মের লোককেই ভালবাসতেন, সেবা করতেন। বাবার মুখে শুনেছি বহু বছর আগে 'ভজন' নামে একটি হিন্দু ছেলে আমাদের বাড়ীতে লালিত পালিত হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় বার্মার রেঙ্গুনে জাপানীরা বোমা ফেলে, সেই বোমার আঘাতে ছেলেটির মা বাবা মারা যায়। ৭/৮ বছরের ছেলেটি আপনজন হারিয়ে ফেলে। তখন আমার মেঝো চাচা মুহাম্মদ আলী ছেলেটিকে আমাদের বাড়ীতে নিয়ে আসেন। আমার মা-বাবা সন্তানের আদরে তাকে অনেক বছর লালন-পালন করার পর তার আত্মীয়-স্বজনরা তার খোঁজ পেয়ে তাকে নিয়ে যায়। আমাদের ছোট বেলায় বাবাকে অনেক হিন্দু লোককে সাহায্য করতে দেখেছি। যেমন ভারতবর্ষ দুভাগ হয়ে ইন্ডিয়া পাকিস্তান হয়ে যাওয়ার পরে ইন্ডিয়া থেকে মুসলমান বিতরণ ও পাকিস্তান থেকে হিন্দু বিতরণ করা এক সাধারণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তারুয়া থেকেও হিন্দুদের জমি দখল করে তাদের বিতরণ করা শুরু হলে বাবা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তাদের জমি বিক্রি করে তাদের হাতে টাকা তুলে দেন। হিন্দুরা অনেকেই বাবার উপর বিশ্বাস রেখে তাদের সম্পত্তি বাবার নামে রেজিস্ট্রি করে দেয়। সে সময় গ্রামের প্রভাবশালী লোকেরা বাবার আশুগঞ্জ থেকে আসার পথে মরণ ফাঁদ ফেলতো কিন্তু আল্লাহ্‌র অসীম কুদরতে বাবা বেঁচে যেতেন। ৪০ বছর পর নারায়ণ নামে এক লোক তার জন্মভূমি তারুয়া ও বাবাকে দেখতে আসেন। নারায়ণ বলেন, 'মরার আগে আমার বাবা ইন্ডিয়া চলে গেলেও মাতৃভূমির টানে তারুয়া এসে মারা যান। মৌলবী সাব-ই বাবার দাহের ব্যবস্থা করেছিলেন। এই মানুষটিকে দেখে আমার মাতৃভূমি দেখা সার্থক হলো।'

বাবা ভাল খাবার পছন্দ করতেন। নিজে খেতেন আর অন্য মানুষদের খাওয়াতেও পছন্দ করতেন। বাবা বাজারে গেলে মাছওয়ালারা সেরা মাছটি বাবার জন্য রেখে দিতেন। নিত্য দিনের খাবারের সঙ্গে দই স্পেশাল খাবার হিসেবে থাকত। বাবা বলতেন, দই মানুষের আয়ূ বাড়ায়। আসলেই বাবার ৯৬ বছরের আয়ূ পাওয়ার বোধ হয় দইও একটি কারণ। পছন্দ করতেন ফলমূল। আম খুব পছন্দ করতেন। আমের সিজনে বাবার স্পেশাল থলে ছিল শুধুই আম আনার জন্যে। আর পছন্দ করতেন ডিমের পুডিং। মা খুব সুন্দর করে পুডিং করতেন। মার পুডিং বানানোর কায়দাটা খুব সুন্দর ছিল। ডিম ও দুধ মিশ্রিত তরল পদার্থটি ঘি মাখানো একটি টিফিন বাটিতে তরল পদার্থটি কয়লার আঁচে দিয়ে দিতেন, খুব সুগন্ধযুক্ত পুডিং হয়ে যেতো।

মাছ খাওয়া ও মাছ ধরা ছিল বাবার প্রিয় শখ। আমাদের ছোট বেলায় দেখেছি প্রতি শুক্রবারে জুমুআর নামাযের পর আমাদের বাড়ী থেকে দু'কিঃমিঃ দূরে তালশহর স্টেশনের পাশে তালশহর বাজারে তাঁর হোমিওপ্যাথিক চেম্বারে বসতেন। এর আগে বাবা শুনিজাল দিয়ে আমাদের নিজস্ব খালে , ডোবায় ও পুকুরে মাছ ধরতে যেতেন। 'ডোলা' (মাছ রাখার বেতের তৈরী পাত্র) নিয়ে বাবার পাশে পাশে হাঁটতাম। দুপুরে খেয়ে-দেয়ে আমাদের নিয়ে মসজিদে যেতেন এবং প্রতি জুমুআয় বাবা খুতবা দিতেন ও ইমামতি করতেন। নামাযে দাঁড়িয়ে বাবা যখন সূরা পড়তেন তখন মনে হতো আল্লাহ্‌তাআলার অসীম করুণা যেন স্বর্গীয় ধারায় বয়ে আসছে উপস্থিত নামাযীদের মাঝে। মানব জীবনের এমন কোন দিক নেই যা বাবার ভিতর ছিল না। অনেকে বাবাকে 'বড় মৌলবী সাব' বলে ডাকতেন। অনেকে বলতেন, মনাব ফেরেশ্‌তা যদি কেউ থাকে তাহলে আহমদ আলী। অনেকে 'বড় পীরসাব' বলেও ডাকতেন অথচ বাবা পীরবাদ পছন্দ করতেন না।

আমরা বাড়ি থেকে ঢাকা বা অন্য কোথাও গেলে বাবা পরিবারের সবাইকে নিয়ে দোয়া করতেন। আশ্চর্য, বাবার দোয়ায় আমরা দেশেবিদেশে বহু জায়গায় ঘুরেছি কিন্তু এখন পর্যন্ত পরিবারের কেউই দৈব দুর্বিপাকে পড়িনি। আমার মনে হয় এটা বাবার দোয়ারই বরকত।

গ্রামের মানুষের কোন সমস্যা হলে বাবার কাছে আসতেন সুপরামর্শের জন্য। কারো বিয়ে-শাদী বা কেউ মামলা মোকদ্দমায় জড়িয়ে গেলে সমস্যা মোকাবেলার জন্য আসতেন বাবার কাছে। একবার গ্রামের হারিস নামে একটি নির্দোষ ছেলে মামলায় জড়িয়ে পড়লো। ছেলের বাবা এসে আমার বাবাকে অনুরোধ করলেন, ছেলেটিকে কিভাবে মামলা থেকে নিষ্কৃতি দেওয়া যায়। বাবা তার নিজের সংসার ফেলে রেখে ১৪ দিনের জন্য ঢাকা গিয়ে পড়ে রইলেন অর্থাৎ চেষ্টা তদবীর যা যা লাগে বাবা কোন কিছু বাদ রাখলেন না। অবশেষে ছেলেটি ছাড়া পেল। কেউ কেউ চাকুরির জন্যও বাবাকে ধরতো, বাবা নিজের পকেটের

পয়সা খরচ করে তাদেরকে কাজের জায়গায় নিয়ে যেতেন।

বাবার জীবনের কাহিনী শুনলে পাঠকরা বলবেন, এগুলো হয়ত সত্য নয় ; কিন্তু এর চেয়ে বড় সত্য এই আমার বর্ণনায় বাবার জীবনের একটি অধ্যায় বর্ণিত হয়েছে মাত্র, অর্থাৎ বাবার মধ্য বয়সে আমার জন্ম। আমার জন্মেরও আগে থেকে বাবার জনসেবার কাহিনী আছে। আসলে কিছু কিছু মানুষ পৃথিবীতে আসে মানুষের জন্য ভালবাসা বিলিয়ে দেয়ার জন্যে। আর কিছু মানুষ আসে হিংস্রতা বিলিয়ে দেয়ার জন্য। হিংস্রতা মানুষের ক্ষতি সাধন করে আর যার ভিতরে ভালবাসা আছে তিনি করেন মানুষের কল্যাণ। আর কল্যাণেরই বৃহত্তর রূপ জনকল্যাণ। বাবা বৃহত্তর রূপটিই ধরে রেখেছিলেন জীবনভর।

এখানে যে কথা বলা আবশ্যক বোধ করছি তা হল আমার বাবা ছিলেন মুক্তপ্রাণ গৃহসন্যাসী আর আমাদের মা ছিলেন চরমপ্রাণ গৃহকর্ত্রী। মা তার গৃহ ও সন্তান ছাড়া কিছুই বুঝতেন না। বাবার নিত্য উপার্জনের সামান্য আয় দিয়ে তার সন্তানদের লালন-পালন করে বড় করেছেন। গ্রামে থেকেও আমাদের ভাইবোনেরা বেশির ভাগই উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েছেন। আমার মাকে রত্নগর্ভা বললেও বাড়িয়ে বলা হবে না।

১৯৬৮ সনে বাবা আশুগঞ্জ থেকে তার চেম্বার পরিবর্তন করে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় চলে আসেন। আশুগঞ্জের চেম্বারের দায়িত্ব দিয়ে আসেন মামাতো ভাইকে। এই মামাতো ভাই আজীবন বাবাকে আপন বড় ভাইয়ের মতো মনে করতেন এবং বিভিন্ন জিনিস বিশেষ করে বিভিন্ন ফলমূল এনে খওয়াতেন।

১৯৬৮ থেকে ১৯৮৭ সন পর্যন্ত ব্রহ্মণবাড়িয়ায় ডাক্তারী করার ফলে আব্বার পরিচিতি আরও বেড়ে যায়। আশুগঞ্জে ভাল ডাক্তার হিসেবে পরিচিতি লাভ করার পর ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে তা আরও বৃদ্ধি পায়। ১৯৬৮ সন থেকে ১৯৮০ সন পর্যন্ত তারুয়া-ব্রাহ্মণবাড়িয়া সড়ক যোগাযোগ ভাল ছিল না। তখন সকাল দশটায় তারুয়া থেকে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় যেতেন ও রাত নয়টার ট্রেনে আসতেন। বাবার শরীর মোটামুটি ভালই ছিল। তিনি বলতেন, এ যে সকাল থেকে ঘর থেকে বের হয়ে সন্ধ্যায় ঘরে ফেরা এটা হ'ল পাখির মত জীবন। দোয়া করি পাখির মতো জীবন থাকতে থাকতে যেন এ পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে পারি (আমীন)।

কথা হচ্ছিল পাখির মত জীবন নিয়ে। বাবা যখন সন্ধ্যা বেলা নীড়ে ফিরতেন। আমাদের অর্থাৎ ছেলেমেয়েদের জন্য বিস্কুট, মিষ্টির পোটনা নিয়ে আসতেন। মনে পড়ে ছোটবেলায় বাবা যখন ঘরে ফিরতেন তখন প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলা ছোট ভাই-বোন ও নাতিপুতিরা অধীর আগ্রহে পথ পানে চেয়ে থাকতাম এবং তাঁকে দেখে সমস্বরে বলে উঠতাম 'আব্বা আইছেগো' আর নাতিপুতিরাও বলে ওঠতো 'ভাই আইছেগো'। আব্বাকে বড় বোনের ছেলে-মেয়েরা ভাই বলে ডাকতো।

এটাতো গেল পারিবারিক ব্যাপার, অন্যদিকে ১৯৮০ সন থেকে তারুয়া ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ার রাস্তা হওয়ার পর থেকে বাবা রিকসাযোগে ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে তারুয়া আসতেন। আসার পথে ছোট ছোট বাচ্চাদের জন্যে চকোলেট নিয়ে আসতেন এবং পথকলিরা আসতো চকোলেট নেওয়ার জন্য। পথকলিরা বাবাকে বুড়ো ডাক্তার সাব ডাকতো। আমি আগেই বলেছি বাবা মৌলবী সাব ও ডাক্তার সাব হিসেবে নিজ গ্রাম ও আসে-পাশের গ্রাম এমনকি আহমদী হওয়ার পর সমগ্র বাংলাদেশে পরিচিতি লাভ করেন। ২০০২ সনে যখন আমি বেলজিয়াম থেকে বাংলাদেশে যাই তখন আব্বা খুব অসুস্থ হয়ে পড়েন, একেবারে যাই যাই অবস্থা। সবার দোয়া ও আব্বার ডাক্তার নাতির প্রচেষ্টায় আল্লাহ্‌র ফযলে সে যাত্রায় আরোগ্য লাভ করেন। পরদিন অনেক রোগী আসে আব্বাকে দেখতে, এসে দেখে ডাক্তার সাব চেয়ারে বসে আছেন। তখন রোগীরা আব্বার কানে কানে বলে 'ডাক্তার যদি আমাদের একটু ওষুধ দেন তো ভাল হয়।' তখন আব্বা বাড়ীর নিজস্ব ওষুধ ঘরে রোগীদের কাঁধে ভর দিয়ে গিয়ে ওষুধ দিয়ে আসেন। আমরা সবাই রোগীদের কান্ডকারখানা দেখে হাসি। কিন্তু রোগীরা পরম বিশ্বাসে অসুস্থ ডাক্তারের ওষুধ খেয়ে ভাল হয়ে যায়। আব্বার রোগীরা তাঁর ওপর বিশ্বাস রাখতো এবং তাদের একান্ত আপনজন মনে করতো। তারা তাদের রোগের কথা বলতে এসে নিজেদের সুখ-দুঃখের কথাও বলে যেত। শুধু সুখ-দুঃখ নয় অনেকে অনেক গোপন কথাও বলে যেত যা আর কারও কাছে বলা যায় না।

বাবা মা যে ঘরে থাকতেন সেখানে দুচৌকি জোড়া দিয়ে বড় একটি বিছানা ছিল। সে বিছানায় আমরা ছোট বেলায় মা বাবার সঙ্গে ঘুমিয়েছি। পরবর্তীতে আমরা যখন বড় হয়ে গেছি, আমাদের কারো অসুখ হলে সেই বিশাল বিছানায় আশ্রয় নিতাম। বাবা আমাদের ও আমাদের সন্তানদের রাতে দোয়াভরা ফুঁ দিতেন। রাত দুটার সময় বাবা ওঠতেন তাহাজ্জুদ নামায পড়ার জন্যে এবং দীর্ঘ সময় ধরে তিনি নামায পড়তেন। অনেক সময় সুর করে সূরা পড়তেন। অনেক সময় ধ্যানের মত করে চোখ বুজে অনেকক্ষণ নীরবে সূরা পাঠ করতেন। যেভাবে মুনি ঋষিরা একনিষ্ঠ চিত্তে ইশ্বরের ধ্যানে মগ্ন হয়, মনে হতো বাবা সেভাবে খোদার ধ্যানে মগ্ন থাকতেন। রাত দুপুরে তাহাজ্জুদ নামায পড়তে ওঠে দীর্ঘ তাহাজ্জুদ নামায পড়ে ফজরের নামায শেষ করে সামান্য ঘুমাতেন।

তারুয়াতে বাবা-কাকাদের একটি সুন্দর জায়গা আছে। সে জায়গাটির নাম 'ঠাকুর বাড়ি'। ৪০ এর দশকে আমার দাদা হিন্দু ঠাকুরদের কাছ থেকে এ জায়গাটি কিনেছিলেন। এই ঠাকুর বাড়িটি দেখতে খুবই সুন্দর। চারদিকে উঁচু খেত এবং মাঝখানে পুকুর। পুকুরটি চৌকোনা লম্বা, দেখতে বেশ সুন্দর। স্বচ্ছ টলটলে ঠান্ডা পানি। গ্রীষ্মের প্রচন্ড গরমে এ পুকুরে গোসল করলে ঠান্ডায় গা জুড়িয়ে যায়। বাবা কাকারাই এ পুকুরটি কাটিয়ে ছিলেন, আগে এ জায়গাটিতে জমি ছিল। ১৯৮৯ সন থেকে এ পুকুরটি লীজ দেয়া হচ্ছে। এর আগে আমার কাকারা শহরে থাকতেন বলে বাবাই এজমালি পুকুরের দেখাশুনা করতেন। প্রতি বছর পুকুরে মাছ ফেলতেন। মাছের চাষ করা হতো এবং মাসে দু'বার জাল ফেলে মাছ উঠাতেন। খুব ভোরে জেলেরা আসত এবং বাবা আমাদের ডেকে তুলে ঠাকুর বাড়ি নিয়ে যেন অর্থাৎ উত্তর থেকে দক্ষিণ পাড়ে। এক পাশে এসে জালটিকে জড়ো করতো। তার ভিতর ছোট বড় নানা রকম রূপালী মাছ ঝিকমিক করতো। রুই, কাতলা, মৃগেল, ছোট মাছ পুটি, আরও কত কি! বাবা ডোলা (ঝুড়ি) ভরে আমাদের এবং আত্মীয়-স্বজনদের মাছ দিতেন এবং গায়ে গরীব দুঃখীদের দুহাত ভরে ছোট মাছ দিতেন। গরীব-দুঃখীরা কেউবা কলাপাতা, কচুপাতা কেউবা আঁচল কেউবা লুঙ্গিতে ভরে মাছ নিয়ে যেত। মা এবং আমরা বোনেরা মিলে মাছ কাটতাম। আমাদের মা সে মাছ ভেজে থালায় বা টুকরিতে দিতেন শুধু শুধু খাওয়ার জন্যে। আমরা ভাই বোনেরা পরমানন্দে সে মাছ পেটপুরে খেতাম। মা পরম তৃপ্তিতে আমাদের মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে আমাদের খাওয়া দেখতেন।

গত ১০/৫/২০০৫ আমার মা চলে গেলেন পরপারে। আমি আগেই বলেছি মা ছিলেন সংসার-অন্তপ্রাণ গৃহিণী। গৃহ, স্বামী ও সন্তান-সন্ততি ছিল তাঁর জগৎ। মাকে কখনো দেখিনি তার শ্বশুরালয়ের চার দেয়ালের বাইরে পা রাখতে। স্বামী-সন্তান নিয়ে সারা দিনরাত ব্যস্ত থাকতেন। স্বামী কি খাবেন, সন্তানরা কোন খাবার খাবে, শরীর মন দিয়ে চেষ্টা করতেন। মা যদি গৃহকোণে সদাব্যস্ত না থাকতেন তাহলে আমরা বড় হতে পারতাম না, আর বাবাও মুক্তপ্রাণ সন্যাসী হতে পারতেন না। মা-বাবাকে ভীষণভাবে ভালবাসতেন। আমরা বড় হওয়া অবধি মাকে কোনদিন তার বাপের বাড়ীতে যেতে দেখিনি। বাবার ভালবাসার টানেই বোধ হয় তিনি মারা যাওয়ার ৪০ দিন পরই ১২ সন্তানের মায়া উপেক্ষা করে চলে গেলেন। সবই বলতে লাগলো এতো দেখি স্বর্গীয় ভালবাসা। কেউ কেউ বলেন, এতো দেখি লাইলি-মজনুকেও হার মানায়। মাকে ঠাকুর বাড়িতে আমাদের পারিবারিক গোরস্থানে আমার বাবার কবরের পাশে নিচুস্থানে কবর দেওয়া হয়েছে। *(সমাপ্ত)*

কাউসার বিনতে আহমদ (বীণা)

ওকীলে আলার দপ্তর থেকে

আমীর
আহমদীয়া মুসলিম জামাত,
বাংলাদেশ।

প্রিয় আমীর সাহেব,

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আইঃ) গত ১৪ অক্টোবর ২০০৫ইং বাইতুল ফুতূহ্ মসজিদ, লন্ডনে জুমুআর খুতবা প্রদান করেন। হুযূর (আইঃ) সূরা আল-বাকারার ১৫৫-১৫৭ নম্বর আয়াতগুলি তেলাওয়াত করেন। আয়াতগুলির অর্থ হলোঃ

"আল্লাহ্‌র পথে যারা নিহত তাদেরকে মৃত বলো না, বরং তাঁরা জীবিত; কিন্তু তোমরা উপলব্ধি করতে পার না।

এবং আমি তোমাদেরকে কিছু ভয়, ক্ষুধা এবং ধন-সম্পদ, জীবন ও ফল ফসলের ক্ষয়ক্ষতি দ্বারা অবশ্যই পরীক্ষা করবো। তুমি শুভ সংবাদ দাও ধৈর্যশীলগণকে।

যারা তাদের ওপর বিপদ আপতিত হলে বলে, 'আমরা তো আল্লহ্‌রই এবং নিশ্চিতভাবে তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তনকারী।" (২ঃ ১৫৫-১৫৭)

হুযূর (আইঃ) বলেন, গত কয়েকদিনে দুইটি হৃদয় বিদারক ঘটনা ঘটেছে যা প্রত্যেক আহমদীর হৃদয়কে বেদনায় ভারাক্রান্ত করেছে এবং প্রত্যেক আহমদীর হৃদয়ে দুঃখ ও বেদনার ঢেউ বয়ে গেছে। প্রথম ঘটনায় 'মঙ্গ'-এ আটজন আহমদীকে নামাযরত অবস্থায় গুলি করে শহীদ করা হয়েছে। এটি অত্যন্ত বেদনাদায়ক ও শোকাবহ ঘটনা। কিন্তু আল্লাহ্‌রওয়াস্তে এই শোক আমাদেরকে ধৈর্য সহকারে সহ্য করতে হবে। ঐশী জামাতকে এই ধরনের দুঃখকষ্ট ভোগ করতে হয়। কিন্তু তারা আল্লাহ্‌র স্মরণাপন্ন হয় এবং কখনও ধৈর্য ও সংযম হারায় না। আহমদীয়া মুসলিম জামাতের একশত বছরের ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, যখনই জামাতের ওপর এই ধরনের সংকটময় মুহূর্ত এসেছে, আহমদীরা সাহসিকতা ও দৃঢ়তার সাথে মোকাবিলা করেছে এবং কখনই আইনকে নিজেদের হাতে তুলে নেয়নি। সেজন্য আল্লাহ্ জামাতের ওপর পূর্বের চেয়ে বেশি রহমত বর্ষণ করেছেন এবং করতে থাকবেন। যাঁরা আল্লাহ্‌র রাস্তায় জীবন দিয়েছেন তারা জামাতের ইতিহাসের অংশ হয়ে গেছেন। তারা অমর হয়ে থাকবেন।

হুযূর (আইঃ) বলেন, আমি যে আয়াতগুলি তিলাওয়াত করেছি তাতে বলা হয়েছে যে, যাঁরা আল্লাহ্‌র রাস্তায় শহীদ হয়েছেন, আমরা যেন তাদের মৃত না বলি। তারা জীবিত। হুযূর (আইঃ) বলেন, এটা কত বড় সম্মান যে তাঁরা অমর জীবন লাভ করেছেন! আল্লাহ্ কখনই জামাতের কুরবানীকে বৃথা যেতে দেননি, ভবিষ্যতেও দিবেন না। আমরা যদি এই বিষয়টি উপলব্ধি করতে পারি। তাহলে শহীদেরা বেহেশ্‌তে শুধু উচ্চ মর্যাদাই লাভ করবেন না। বরং আল্লাহ্ শহীদদের পরিবারের দুঃখকষ্ট সহজ করে দিবেন এবং তাদের ওপর রহম করবেন। মহানবী (সঃ) বলেছেন যে, মুমিন যখন দুঃখ, বেদনা, দূর্যোগ বা ক্ষতির সম্মুখীন হয়, তখন সে ধৈর্যধারণ করে। এটি তার জন্য রহমতের কারণ হয়। আল্লাহ্‌তাআলা শহীদদের আত্মীয়-স্বজনদের ধৈর্য দান করুন এবং তাদের অশেষ রহমত দান করুন।

হুযূর (আইঃ) বলেন, এক মাসেরও বেশি পূর্বে কোয়েটাতে একজন আহমদী শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করেন। আপনাদের দোয়াতে তাঁর পরিবারকেও স্মরণ রাখবেন।

হুযূর (আইঃ) বলেন, দ্বীতীয় বেদনাদায়ক ঘটনাটি হ'ল, এক ভূমিকম্প পাকিস্তানের উত্তরাঞ্চল এবং কাশ্মীরে বিরাট ধ্বংস যজ্ঞ সৃষ্টি করেছে। এই ঐশী ধ্বংস যজ্ঞের কারণে প্রত্যেক আহমদী দুঃখ ও বেদনাহত হয়েছেন। আমি সহানুভূতি ও শোক জানিয়ে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ও আযাদ কাশ্মীরের প্রধান মন্ত্রীকে পত্র দিয়েছি এবং সম্ভাব্য সকল সহায়তার আশ্বাস দিয়েছি। দেশের প্রতি আমাদের ভালবাসা দাবী করে যে, দেশেরও জাতির এই কঠিন সময়ে আমরা আমাদের নিজেদের দোয়া ও কাজের মাধ্যমে আমাদের ভাইদের সাহায্য করব। আহমদীয়া মুসলিম জামাত পাকিস্তানের সদস্যরা ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের সাহায্যে তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছেন। প্রবাসী আহমদীরাও পাকিস্তান সরকারের সাহায্যে নিজেদের হস্ত প্রসারিত করুন। আর্ত মানবতার সেবা করা আমাদের কর্তব্য। কোন কোন ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় খোদ্দামুল আহমদীয়া টিমই প্রথম সাহায্য নিয়ে পৌঁছেছে। ইসলামাবাদের খোদ্দামরা ভুমিকম্পের পরপরই আশেপাশের গ্রামগুলির হাজারহাজার লোকদের খাওয়ানো শুরু করেন। ট্রাক ভর্তি চাল, কম্বল, গরম কাপড় এবং অন্যন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী আহমদীয়া মুসলিম জামাত, পাকিস্তানের পক্ষ থেকে ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্তদের নিকট পৌঁছানো হয়েছে। লন্ডন থেকে পাঁচজন ডাক্তার ২০ (বিশ) হাজার পাউন্ড মূল্যের ঔষধ নিয়ে ঐ সকল এলাকায় পৌঁছে গিয়েছেন। ৫০০ (পাঁচশত) তাঁবুও পাঠানো হয়েছে। "হিউমিনিটি ফার্ষ্ট"এর মাধ্যমে জামাতও মানবতার সেবায় বিরাট কাজ করে যাচ্ছে।

হুযূর (আইঃ) এইরূপ অবস্থায় মুহম্মদ (সঃ) এর আদর্শ অনুসরণের এবং আল্লাহ্‌র নিরাপত্তা ও ক্ষমা প্রর্থনার জন্য জামাতের প্রতি আহ্বান জানান। হুযূর (আইঃ) দুনিয়ার হেদায়াতের জন্য দোয়া করতে জামাতকে আহ্বান করেন যেন দুনিয়াবাসী এইসব প্রাকৃতিক আজাব থেকে রক্ষা পায়।

অনুগ্রহপূর্বক হুযূর (আইঃ)-এর এই দিক নির্দেশনা আপনার জামাতের সদস্যদের নিকট পৌঁছে দিবেন। জাযাকুমুল্লাহ্

ওয়াস্‌সালাম

চৌধুরী হামিদুল্লাহ্
তাহরীকে জাদীদ আঞ্জুমানে আহমদীয়া,
পাকিস্তান

অনুবাদক- **বশিরউদ্দিন আহমদ**

মুলাকাৎ

বাঙ্গালী বন্ধুদের সাথে হুযূর (রাহেঃ)-এর ১৬-১০-২০০১ তারিখের সাক্ষাৎকার

(এম.টি.এ-এর মাধ্যমে সরাসরি প্রচারিত)

প্রথম প্রশ্ন ঃ হুযূর (অম্লরোগ) Acidity একটি বড় সমস্যা। প্রায় সব দেশেই আছে এবং Acidity (অম্লরোগ)-এর ফলে আরও অনেক রোগ সৃষ্টি হয়। যেমন বদ্‌হজম্ ইত্যাদি। হুযূর এর আসল কারণ এবং প্রতিকার কী?

হুযূর (রাহেঃ) উত্তর দেন ঃ Acidity (অম্লরোগ)-এর মূল কারণ হচ্ছে আমাদের Stomach (পাকস্থলী) আমরা যা খাই সেই খাদ্যদ্রব্যকে সঠিকভাবে নীচে প্রেরণ করে না অর্থাৎ আমরা যা খাই ওসব দ্রব্যাদি Stomach (পাকস্থলী)-এর ভিতরেই অনেক বেশি সময় ধরে জমা থাকে। এ অবস্থায় কয়েক রকম অপরফ (অম্ল) তৈরী হয়ে থাকে। এসব অপরফ (অম্ল)-এর কার্যকারিতা শরীরের জন্য মঙ্গলজনক নয়। এসব অপরফ (অম্ল)-এর সঠিক Circulation (পরিচালন) ক্রিয়ার অভাবের ফলেই সমস্যাগুলোর সৃষ্টি হয়; যেমন টষপবৎ (আলসার) হয়। আমার লেখা হোমিওপ্যাথি বইয়ে আমি এ বিষয়ে কয়েকটি ঔষধের নাম উল্লেখ করেছি। এক সময় আমারও Acidity (অম্লরোগ)-এর সমস্যা হয়েছিল। কিন্তু আল্লাহ্‌র কৃপায় আমি এখন ভাল হয়ে গেছি। সত্যিই Acidity (অম্লরোগ) একটা খারাপ রোগ। এর জন্যই মাথা ব্যথা ইত্যাদি হয়ে থাকে। আপনার যদি Acidity (অম্লরোগ) রোগ হয়ে থাকে তো আপনিও হোমিও চিকিৎসা করাতে পারেন।

হুযূর আরও বলেন, কোন কোন ব্যক্তি বলে থাকে যে, Acidity (অম্লরোগ) বেশি হয়ে গেলে গলার ভিতর আঙ্গুল ঢুকিয়ে বমি করে কিছু পরিমাণ অপরফ (অম্ল) বের করেও আরাম পাওয়া যায়। আমিও এক সময় এ রকম করতে বাধ্য হয়েছিলাম।

দ্বিতীয় প্রশ্ন ঃ হুযূর একজন মুজাদ্দিদও কি কোন ভুল করতে পারেন? আমরা মুজাদ্দিদগণের তালিকায় আল্লামা সাইউতীর নাম দেখতে পাই। হুযূর কিন্তু হাদীসের দরসে আল্লামা সাইউতীর কতিপয় হাদীস সম্পর্কে বিরূপ সমালোচনা করেছিলেন। এ ব্যাপারটা একটু বুঝিয়ে বলুন।

হুযূর (রাহেঃ) উত্তর দেন ঃ শুধু নবীগণই নিষ্পাপ। অন্যরা ভুল করতে পারেন। আল্লামা সাইউতী মুজাদ্দিদ ছিলেন কি ছিলেন না সেটা আল্লাহ্‌তাআলাই জানেন, কিন্তু মুজাদ্দিদ্‌রাও ভুল করতে পারেন।

৩য় প্রশ্ন ঃ সূরা দুখান-এর আয়াত "ফারতাকিব ইয়াওমা তা'তিস্‌সামাউ বিদুখানিম্ মুবিন" এর ব্যাখ্যা করবেন কি?

আয়াতটির বাংলা অনুবাদ হ'ল অতএব তুমি সেদিনের অপেক্ষা কর যেই দিন আকাশ স্পষ্ট ধুম্র নিয়ে আসবে।

হুযূর এ আয়াতটির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেনঃ এটি আনবিক যুদ্ধ সম্পর্কে একটি ভবিষ্যদ্বাণী। মহানবী (সঃ)-এর যুগে কেউ কল্পনাই করতে পারতো না, "আনবিক বোমা বা আনবিক যুদ্ধ কোন দিন হবে। মহানবী (সঃ)-এর সময় একটা আধ-পাগ্‌লা ধরনের লোক লোক ছিল যার সম্বন্ধে সাধারণ লোকের ধারণা ছিল যে, সেই ব্যক্তিই "দাজ্জাল"। মহানবী (সঃ) একদিন সেই ব্যক্তির কাছে তাকে পরীক্ষা করার জন্য গেলেন এবং দেখলেন, লোকটি একটি গাছের আড়ালে বসে আছে। তখন মহানবী (সঃ) সূরা দুখান-এর কথা মনে করে এর আয়াতগুলো আওড়াতে থাকলেন। তখন সেই আধ-পাগ্‌লা ব্যক্তিও বলতে শুরু করলো "দুখ্ দুখ্ কিন্তু সে পুরোপুরি দুখান শব্দটি উচ্চারণ করলো না। মহানবী (সঃ) তারপর সাহাবাগণ এর কাছে ফিরে এসে বললেন, আধ পাগ্‌লা ব্যক্তি দাজ্জাল নয়।

হুযূর সূরা দুখান-এর পরবর্তী কয়েকটি আয়াত সম্পর্কে বললেন, ওগুলোতে বলা হয়েছে, "তুমি সে সময়ের অপেক্ষা কর যখন স্পষ্ট ধুম্র নিয়ে আসবে এবং মানবগুলিকে আচ্ছাদিত করে ফেলবে। ইহা একটি মহাযন্ত্রণাদায়ক আযাব হবে। তারা চিৎকার করে বলবে, "হে প্রভু প্রতিপালক! আমাদের ওপর হ'তে এ আযাব দূর করো। নিশ্চয়ই আমরা ঈমান আনছি। তখন উপদেশ গ্রহণ তাদের কী উপকার সাধন করবে? অথচ পূর্বে তাদের নিকট একজন স্পষ্ট বর্ণনাকারী রসূল আগমন করেছিল।"

হুযূর বলেন, এ আয়াতসমূহে স্পষ্টভাবেই বোঝা যায় সেই ধূম্র বা ধোঁয়ার প্রকৃতি কেমন হবে। সেটি এমন ধোঁয়া হবে যার নীচে কোন রকম আরামদায়ক পরিবেশ থাকবে না। সেটা এক যন্ত্রণাদায়ক অবস্থা হবে।

৪র্থ প্রশ্ন ঃ বর্তমান পরিস্থিতির আলোকে অনেকেই বলে যে, সন্ত্রাসের সাথে কিছুটা হলেও ইসলামের একটা সম্পর্ক অবশ্যই রয়েছে। আমাদের আহমদী স্কুল কলেজগামী ছাত্ররা এ রকম মন্তব্য শুনে থাকে। বিরুদ্ধবাদীরা এ ব্যাপারে কুরআনের কয়েকটি আয়াতও পেশ করে থাকে যেমন সূরা আল্ বাকারার আয়াত ১৯১ হ'তে ১৯৮ পর্যন্ত। এ বিষয়ে দয়া করে আলোকপাত করুন।

হুযূর (রাহেঃ) উত্তর দেন ঃ এতে দোষের কি আছে? বর্তমান যুগেও এ কথা স্বীকৃত যে, অন্য পক্ষ যুদ্ধ শুরু করলে আক্রান্ত পক্ষ যুদ্ধ করার অধিকার রাখে। অর্থাৎ যদি এক পক্ষ তরবারি তুলে আক্রমণ করে তো অন্য পক্ষ ন্যায় সংগতভাবে নিজেকে বাঁচাবার জন্য তরবারি তুলবে। এখানে তো মুসলমানদেরকে এ নির্দেশও দেয়া আছে যে, কোন বাড়াবাড়ি করবে না। এ দিক থেকে পবিত্র কুরআন অত্যন্ত ভাল শিক্ষা দিয়েছে অর্থাৎ যুদ্ধের সময়ও ভারসাম্য নিশ্চিত করতে বলেছে। এজন্য আমি তো বুঝতেই পারছি না আজকালকার বিরুদ্ধবাদীরা পবিত্র কুরআনের আয়াতসমূহ এবং সন্ত্রাসের মধ্যে কী সামঞ্জস্য দেখতে পাচ্ছেন। আসলে তো এ আয়াতগুলো কঠিন ভাষায় সন্ত্রাসের নিন্দা করছে।

হুযূর বলেন, মানুষ হত্যা করার চেয়েও ফিৎনাকে জঘন্য অপরাধ বলা হয়েছে। ফিৎনা হচ্ছে মানুষকে তার ধর্ম থেকে বিচ্যুত করার প্রচেষ্টা বা বলপ্রয়োগ করে বাধ্য করা। যারা ফিৎনা করবে তাদের বিরুদ্ধে সঠিক পদক্ষেপ ও শাস্তি দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং এটা ন্যায়সংগত অধিকার যা মুসলমানদের কাছে থাকবে।

৫ম প্রশ্ন ঃ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) লিখেছেন ত্রিত্ববাদ (Trinity) St. Paul এর দ্বারা উদ্ভাবিত একটি ধর্ম বিশ্বাস। এখানে প্রশ্ন হচ্ছে, St. Paul মৃত্যু বরণ করেন ৬৩ থেকে ৬৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে। অপরদিকে হযরত ঈসা (আঃ) মৃত্যুবরণ করেন ১২০ খৃষ্টাব্দে। হুযূর আপত্তিকারীদের প্রশ্ন, হযরত ঈসা (আঃ)-এর জীবদ্দশায় ত্রিত্ববাদের বিকাশ কিভাবে ঘটল?

হুযূর (রাহেঃ) উত্তর দেন ঃ আপত্তিকারীরা এখানে একটা ভুল করছে। তারা এটা খেয়াল করছে না যে, হযরত ঈসা (আঃ) প্যালেস্টাইন থেকে ক্রুশীয় ঘটনার পর হিজরত করে বহু দূর কাশ্মীরে চলে গিয়েছিলেন এবং সেখানেই ১২০ বৎসর বয়সে মৃত্যুবরণ করেছিলেন। St. Paul (সেন্টপল) হযরত ঈসা (আঃ)-এর হাওয়ারী বা শিষ্য ছিলেন না। St. Paul হযরত ঈসা (আঃ)-এর অনুপস্থিতিতে বা বর্তমানে Trinity এর প্রচার আরম্ভ করে দিয়েছিলেন। St. Paul নিজের চোখে হযরত ঈসা (আঃ)-কে কোন দিনও দেখেনি। তিনি দাবী করেছিলেন যে, দিব্য দৃষ্টিতে হযরত ঈসা (আঃ)-এর দর্শন লাভ করেছিলেন। St. Paul ত্রিত্ববাদের প্রচলন করেছিলেন। যারা হযরত ঈসা (আঃ)-কে স্বচক্ষে দেখেছিলেন তাদের মধ্য থেকে একজনও ত্রিত্ববাদ সমর্থন করেনি।

৬ষ্ঠ প্রশ্ন ঃ হুযূর ভবিষ্যদ্বাণী তো এ রকম ছিল যে, মসীহ্ দ্বিতীয়বার পৃথিবীতে আগমন করলে গোটা বিশ্বে শান্তি বিরাজ করবে। কিন্তু হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর আসার পর তো দু'টি বিশ্বযুদ্ধ হয়ে গেল এবং তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের আশংকাও আমাদের সামনেই আছে।

হুযূর (রাহেঃ) উত্তর দেন ঃ এটা মহানবী (সঃ)-এর বাণী ছিল যে, মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর যুগে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে। এর অর্থ হ'ল যারাই হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-কে গ্রহণ করবে তারাই শান্তি লাভ করবে। যারা মসীহে মাওউদ (আঃ)-কে মানবে না তাদের জীবনে কোন শান্তি আসতে পারে না। আহমদীরা যেখানেই আছে হউক না আফ্রিকা বা অন্য কোন দেশে তারা সবাই শান্তিতে আছে। পৃথিবীতে সন্ত্রাস আছে কিন্তু আহমদীরা পৃথিবীর সকল দেশেই শান্তিপূর্ণ জীবন যাপন করছে। এ শান্তি তারা মসীহে মাওউদ (আঃ)-কে মান্যকরার ফলে লাভ করছেন। যারা মানবে তাদের জন্যই ছিল। বিশ্ব শান্তির ঐ প্রতিশ্রুতি অমান্যকারীদেরকে দেয়া যেতে পারে না।

সংকলন ও অনুবাদ

মরহুম আলহাজ্জ নূরুদ্দীন আমজাদ খান চৌধুরী

'ম্যায় তেরা দার ছোর কার জাঁউ কাহাঁ'

(আমি তোমার দার ছেড়ে যাব কোথায়)

মূল ঃ হযরত মির্যা বশিরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ)

আমি তোমার দার ছেড়ে যাব কোথায়
হৃদয়ের তৃপ্তি আর প্রশান্তি পাব কোথায়?
এখানে না কাঁদবো, তো কাঁদব কোথায়
এখানে না চিল্লাবো, তো চিল্লাবো কোথায়?
তোমার সামনে দু'হাত পাঁতবো না তো
কাঁর সামনে আর দু'হাত আমি পাঁতবো বলো?
জান তো তোমার দরবারে, কুরবান হয়ে গেল
এখন আর কাঁর দরবারে মাথা ঠুকবো বলো?
ব্যথিত হৃদয়ে সান্তনা কে দেবে তুমি ছাড়া
দুশ্চিন্তার বোঝা আর বেদনা নিয়ে যাব কোথায়?
হৃদয়ই তো ছিল, বাস্ তা-ও-তো তোমায় দিয়ে দিলাম
এখন আমার কামনা বাসনাকে দাফন করবো কোথায়।

ভাষান্তর ঃ **কাওসার আহমদ**, হল্যান্ড

[নযমের পুস্তক 'কালামে মাহমুদ' থেকে]

তরবিয়তী ক্লাস অনুষ্ঠিত

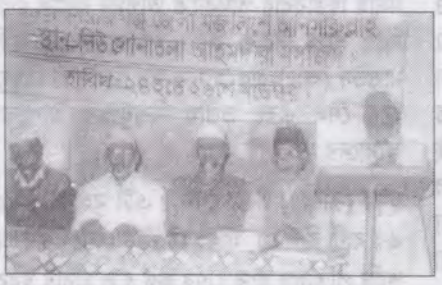

আল্লাহ্‌তাআলার খাস ফযলে বগুড়া সিরাজগঞ্জ জেলা মজলিসে আনসারুল্লাহ্‌র দ্বিতীয় বার্ষিক তালিম তরবীয়তি ক্লাস ও ইজতেমা নিউসোনাতলা আহমদীয়া মসজিদ, সারিয়াকান্দি, বগুড়ায় অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে শেষ হয়। ২৪ শে নভেম্বর বাদ মাগরেব প্রোগ্রাম শুরু হয় এবং ২৬শে নভেম্বর বিকাল ৩ টায় শেষ হয়। অনুষ্ঠানে নায়েবে সদর সফে দওম মোহতরম মাহবুব আজম রেজা, মাওলানা আব্দুল আযিয সাদেক সাহেব এবং রাজশাহী জেলা নায়েম জনাব আতাউর রহমান যোগদান করেন।

বক্তাগণ তরবিয়ত সেশনে কুরআন শিক্ষার গুরুত্ব, আনসারুল্লাহ্‌র দায়িত্ব, গীবত ও অপবাদ একটি মারাত্মক ব্যাধি, চাঁদার গুরুত্ব, ওসিয়্যতের গুরুত্ব। তরবিয়তি মূলক বক্তব্য রাখেন সর্ব জনাব মাহবুব আজম রেজা, মাওলা আব্দুল আযিয সাদেক ও রিজিওনাল নাজেম। ক্লাস শেষে বিভিন্ন প্রতিযোগিতা হয়। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীদের সকলকে পুরস্কৃত করা হয়। স্থানীয় মজলিসের সকলেই সার্বিক সহযোগিতা করেন। সমাপনি অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন নায়েব সদর সফে দওম সাহেব।

প্রফেসর রাজীব উদ্দিন আহমদ
রিজিওনাল নাজেম
রাজশাহী রিজিওন

শুভ বিবাহ

❖ গত ২০-০৫-২০০৫ইং জনাব আবু তাহের মোল্লাহ্‌ এর কন্যা, মোসাম্মাৎ ইয়াসমিন আক্তার সাং তারুয়া বি. বাড়িয়া এর সাথে জনাব মরহুম আজিমউদ্দিন এর পুত্র জনাব বাসেদ আহমদ সাং ঘোড়াদিয়া নরসিংদী এর বিয়ে ১,০০০০১/-(এক লক্ষ এক) টাকা মোহরানা ধার্যে সম্পন্ন হয়।

রেজিষ্ট্রেশন নং ০৫০৮/০৫

❖ গত ২৯/৪/০৫ইং আব্দুস ছাত্তার এর কন্যা, মোসাম্মাৎ সালমা পারভীন সাং যতীন্দ্রনগর শ্যামনগর, জেলা সাতক্ষীরা এর সাথে জনাব মোস্তফা আলী এর পুত্র জনাব রওসান আলী সাং বংশীপুর ঈশ্বরপুর শ্যামনগর জেলা সাতক্ষীরা এর বিয়ে ১০,০০১/- (দশ হাজার এক) টাকা মোহরানা ধার্যে সুসম্পন্ন হয়।

রেজিষ্ট্রেশন নং ০৫১০/০৫

ALL KNOWING GOD

Believe in the unseen
Have faith in your lord
Who loves you no doubt
In phases even and odd
And he is there for you
And he breakes the seal
And uncovers the hidden truths
Before your eyes in life's deals
And he is the only one
Who helps you through signs
By sending his gracious mercy
In layers deep and fine
And he is the all knowing god
Who stops us from going astray
By guiding us through out
In life's fair and ugly days
And that is why I wish
To give special thanks to him
With whom my life is stitched
With peace, love, trust and vim

SEEMA CHOWDHURY

আল্লাহ্‌ সব জানেন

অদৃশ্যকে বিশ্বাস করো
আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করো
যে তোমাকে ভালবাসবে নিঃসন্দেহে
সুখে দুঃখে সর্বাবস্থায়
এবং আল্লাহ্‌ সেখানে কেবল তোমারই জন্য
এবং তিনি (আল্লাহ্‌) সঠিক পথের সন্ধান দেন
এবং আল্লাহ্‌ অন্ধকে উন্মোচন করেন
আমাদের চোখের সামনে সত্য প্রকাশ করেন
এবং তিনিই একমাত্র
যিনি তোমাকে সাহায্য করবেন মোযেযা দেখিয়ে
এবং তিনি আল্লাহ্‌, যিনি সবকিছু জানেন
আমাদের সহজ সরল পথ প্রদর্শন করেন
এজন্যই আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ
এবং তাঁর সাথেই আমাদের শান্তি,
ভালবাসা ও হৃদ্যতার সম্পর্ক

ভাষান্তর–ফায়েজা হোসেন

শোক সংবাদ

বিশিষ্ট হোমিও চিকিৎসক ডাঃ আবুল কাসেম পিতা মৃত আব্দুল মজিদ গত ১০ই ডিসেম্বর ২০০৫ রোজ শনিবার সকাল ১০ ঘটিকার সময় ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন) মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৬ বছর। শনিবার বাদ আসর বকশীবাজার মসজিদ কমপ্লেক্সে ন্যাশনাল আমীর জনাব মোবাশেরউর রহমান সাহেব এর উপস্থিতিতে ও পরে বাদ মাগরীব (সন্তাপুর) নারায়ণগঞ্জ এবং বাদ এশা তারুয়ায় জানাযার পর তাঁর মা এবং মামাদের পাশে দাফন করা হয়।

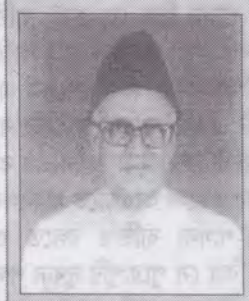

তিনি তারুয়া গ্রামের মৌলবী ডাঃ আহমদ আলী সাহেব ও সাবেক ন্যাশনাল আমীর জনাব মোস্তফা আলী সাহেবের আপন ভাগিনা ছিলেন। তিনি জামাতের খেদমত ও আর্ত মানবতার সেবায় নিবেদিত প্রাণ ছিলেন। হোমিও চিকিৎসক হিসাবে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছিলেন। তিনি রুগীদের সেবার জন্য নিজেকে সম্পূর্ণরূপে বিলিয়ে দিতেন। তিনি সহজ সরল জীবন যাপন করতেন। মৃত্যুকালে স্ত্রী, ছেলে মেয়ে ও বহু নাতি-নাতনী এবং অগণিত আত্মীয়-স্বজন ও গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। আল্লাহ্‌তাআলা যেন তাঁর অপার অনুগ্রহে তাকে জান্নাতুল ফেরদৌস দান করেন তাই জামাতের সকল ভাই বোনদের নিকট বিশেষভাবে দোয়ার আবেদন জানাচ্ছি এবং তার পরিবারের সদস্যদেরকে যেন জামাতের খেদমত করার তৌফিক দান করেন। আমীন।

খালেদ বিন কাসেম (খালেদ)

TRUST THE LOGO

CALL CONCORD

CONCORD CONDOMINIUM LTD.

CONCORD CENTRE 43, NORTH GULSHAN C/A, DHAKA-1212
Tel : 8824724, 8812220, 8824076, Email-mhk@bdmail.net Fax : 880-2-8823552

সূচনা রেন্ট-এ-কার
যে কোন স্থানে যে কোন সময়ে ট্রিপের
জন্য যোগাযোগ করুন ।

সালমান

৬৭৬/৩২ ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা
ফোন ঃ ৯১১৮৭৪৯

পাক্ষিক আহমদীর
অব্যাহত অগ্রযাত্রায়
আমাদের
অভিনন্দন

PRODUCER OF QUALITY NEON SIGN, BELL SIGN, PLASTIC SIGN, HOARDINGS, GIFT ITEMS ETC.

AIR-RAFI & CO.
120/32 Shajahanpur, Dhaka-1217
Phone : 414550, 9331306

স্বাচ্ছন্দ্য ও মনোরম পরিবেশে
স্বাদে ভরপুর রুচিকর খাবার
পরিবেশনে অনন্য

ধানসিঁড়ি রেস্তোরা ১
নীচতলা
রোড নং ৪৫ প্লট ৩২/১
গুলশাল ২ ঢাকা ।
ফোন ঃ ৯৮৮২১২৫

ধানসিঁড়ি খাবার
ধানমন্ডি অর্কিড প্লাজা
(রাপা প্লাজার পার্শ্বে)
ফোন ঃ ৯১৩৬৭২২

New Vol. No. 68 ❑ 12th Issue
Fortnightly

The AHMADI

December 31, 2005. ❑ Tk. 10.00
রেজি ঃ নং-ডি, এ-১২

ভারতীয় লোকসভার মাননীয় স্পীকার সোমনাথ চট্টপাধ্যায়-এর সাথে সাক্ষাৎ করছেন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আইঃ)

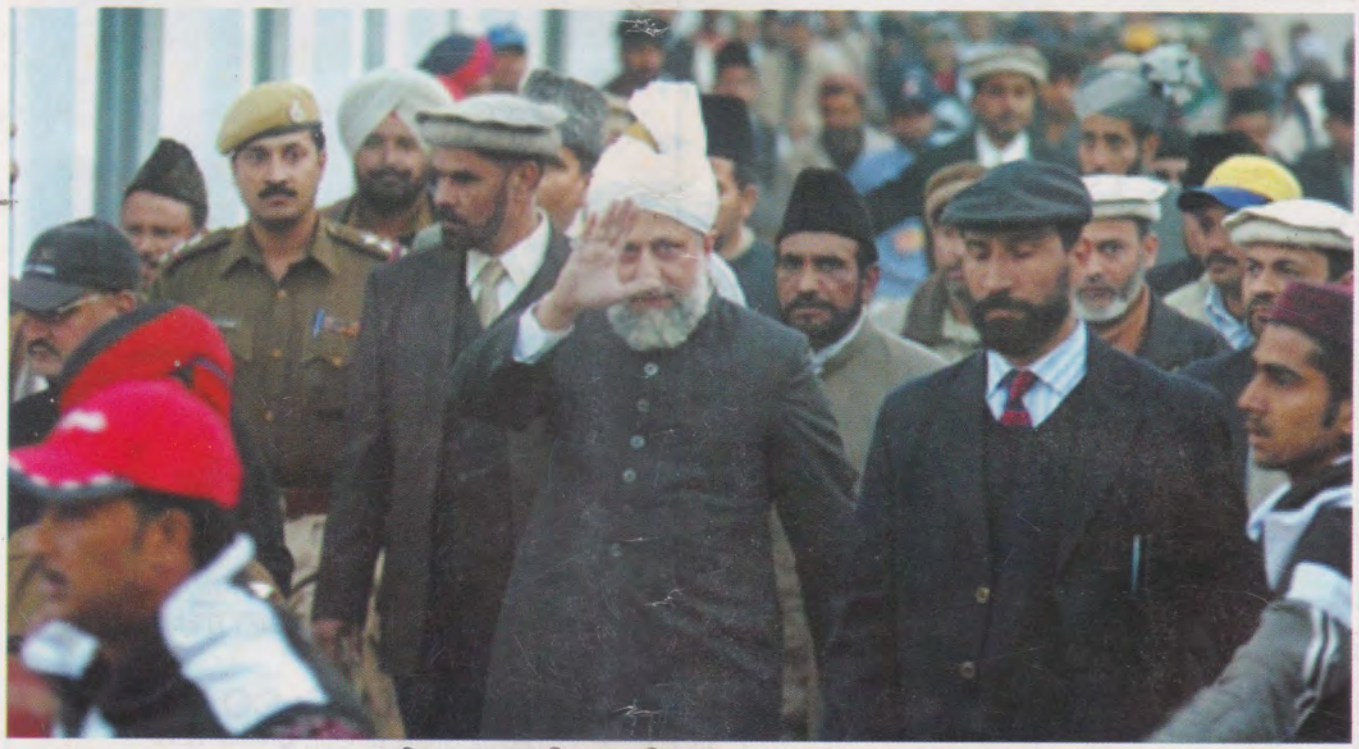

কাদিয়ানে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আইঃ) এর শুভাগমন

Printed and Published by Muhammad F. K. Molla at Ahmadiyya Art Press, 4, Bakshi Bazar Road,
Dhaka-1211 on behalf of Ahmadiyya Muslim Jamaat, Bangladesh.
Editor in Charge: Mahbub Hossain, National Secretary Ishaat
Phone: 7300808, 7300849 Fax: 880-2-7300925 E-mail: amgb@bol-online.com